সাম্যবাদ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে লেনিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য ৩

রুশ বিপ্লব এবং বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত ৪

ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় সমাবেশ ৫

দেশে দেশে জনবিক্ষোভ কারণ ও করণীয় ৮

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২০, মূল্য ৫ টাকা

লাগামহীন গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিধান রেখে আইন পাশের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বছরে যতবার খুশি গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর জন্য 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) বিল-২০২০' জাতীয় সংসদে পাশ করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং জনস্বার্থে অবিলম্বে এই সংশোধনী বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন' এর পূর্বের আইন অনুযায়ী বছরে একবারের বেশি গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বৃদ্ধির সুযোগ ছিল না। সে আইন সংশোধন করে বছরে যতবার খুশি দাম বাড়ানোর আইন করা আওয়ামী লীগ সরকারের চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী ও জনবিরোধী পদক্ষেপ। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মুনাফার স্বার্থে সরকারের জ্বালানী নীতি পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে। আমরা দেখছি, সরকার ব্যয়বহুল রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। চাহিদা না থাকায় উৎপাদন বন্ধ অবস্থায়ও তাদেরকে ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্র ভাড়া পরিশোধের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। গত ৬ বছরে অলস কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বসিয়ে বসিয়ে ৬২ হাজার কোটি টাকা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। গ্যাস সংকটের কথা বলে সরকার আমদানিকৃত তেলনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে যাচ্ছে, ব্যয়বহুল এলএনজি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কয়লা আমদানি করছে, সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্প, বিরাট ঝুঁকি ও ঋণের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অথচ, দীর্ঘদিন দেশের গ্যাস অনুসন্ধান স্থগিত করে রেখেছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে বসিয়ে রেখে বিদেশী কোম্পানীকে গ্যাসক্ষেত্র ইজারা দেওয়া হচ্ছে, তাদের থেকে উচ্চদামে গ্যাস কেনা হচ্ছে। সাগরের গ্যাসসম্পদ রপ্তানির বিধান রেখে বিদেশী কোম্পানির সাথে উৎপাদন-বন্টন চুক্তি করা হচ্ছে। দেশে সুলভ মূল্যে পরিবেশবান্ধব সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও সেদিকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে গ্যাস ও বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির দায় আওয়ামী লীগ সরকারের, জনগণের নয়। গত ১০ বছরে সরকার সাতবার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। সর্বশেষ গত মার্চে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। এখন জনগণের উপর আরো মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে এ গণবিরোধী বিল অনির্বাচিত ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাহীন সংসদে পাস করা হয়েছে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "করোনা মহামারীতে জনগণ অর্থনৈতিকভাবে চরম দুর্দশায় নিপতিত। বাজারে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরো অসহনীয় করে তুলেছে। এর উপর দেওয়া হয়েছে বিদ্যুতের ভূতুড়ে বিল। আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত ও রিক্ত জনসাধারণের ঘাড়ের উপর উপর্যুপরি মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানোর অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হলো এ বিল পাশের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগ সরকার গ্যাস-বিদ্যুৎ-রেল-শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সমস্ত সেবাখাতকে বেসরকারিকরণ করে পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চায়। এই জন্যই সরকার জ্বালানিসহ সকল সেবা পণ্যের মূল্য ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে বাণিজ্যিকীকরণ করতে চায়। সেই অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন সংশোধন করে বছরে একাধিকবার গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিধান চালু করা হয়েছে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের এই গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হওয়া ও ভবিষ্যতে গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির যেকোনো সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান।

লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে করণীয় কী?

"বেশী করে আলু খান, ভাতের উপর চাপ কমান" – সরকারের একসময়কার স্লোগান এখন কৌতুকে পরিণত হয়েছে। কেউ কি কখনো ভেবেছে ১৫-২০ টাকা দামের আলু ৪৫-৫০ টাকায় কিনতে হবে! মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট দেশের গরিব মানুষের সংসারে সম্বল ছিল আলু-পেঁয়াজ-কাঁচামরিচ সহযোগে আলুভর্তা। সেই আলুভর্তাই আজ রীতিমতো দামী খাবারে পরিণত হয়েছে! আলু, পেঁয়াজ, চাল, তেল, চিনি, ডাল, সবজি – সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিক বেশি। মূল্যবৃদ্ধির ফলে শুধু খাবারের পেছনেই নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মাসিক খরচ ১৫০০-১৮০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। সে তুলনায় আয় কি বেড়েছে? বরং করোনা মহামারীতে অর্থনৈতিক দুর্দশায় সাধারণ মানুষের আয় কমে গিয়েছে। করোনার কারণে নতুন করে ১

কোটি ২০ লাখ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে (দিনে আয় ১৫৫ টাকার কম) নেমে গিয়েছে। এ সময়ে মূল্যবৃদ্ধি 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'-এর মতন। করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত জনগণ যাতে সংকুচিত

● ২ এর পাতায় দেখুন

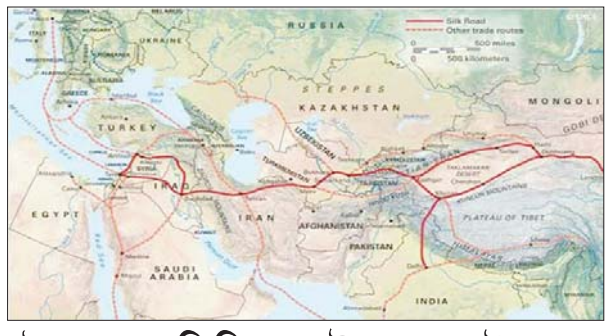

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং বাংলাদেশ

করোনা মহামারীর মধ্যেও গত ১৪ অক্টোবর মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন বিগান বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, করোনার মধ্যেও তিনি এদেশে ছুটে এলেন? তার বয়ানেই জানা গেল, তিনি আমেরিকার 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল'-এ বাংলাদেশকে যুক্ত করার জন্য বৈঠক করতে এসেছেন। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া না হওয়া নিয়ে তখনই আলোচনাটা বড় পরিসরে এলো।

ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি কী? ইন্দো-প্যাসিফিক (Indo-Pacific) অঞ্চল হলো ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) ও প্রশান্ত মহাসাগর(Pacific Ocean) এর সাথে জুড়ে থাকা সমুদ্র অঞ্চল, যা পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার উপকূলীয় দেশগুলো হতে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চল দিয়ে বিশ্ববাণিজ্যের ৮০ শতাংশ পরিচালিত হয়। ভৌগোলিকভাবে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশগুলোর

● ৬ এর পাতায় দেখুন

পাটকলের পর এবার চিনিকল বন্ধ : কার স্বার্থে?

বন্ধ হতে চলেছে রাষ্ট্রায়ত্ব ১৫টি চিনিকল। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) থেকে এ মর্মে বিশেষ চিঠি গত ১০ সেপ্টেম্বর চিনিকলগুলোতে পাঠানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিএসএফআইসি'র চিফ অব পার্সোনাল রফিকুল ইসলাম বলেন, "সরকার এসব চিনিকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে" (দৈনিক যুগান্তর ১৫ সেপ্টেম্বর '২০)। চিনিকলগুলো বন্ধ হলে ১ লাখেরও অধিক শ্রমিক-কর্মচারী চাকুরী হারাবে। আখ চাষের সাথে যুক্ত ৫ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা জানি চিনিকলগুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে লোকালয়, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ আরও বহু কিছু। একে ঘিরেই বহু মানুষের জীবন - জীবিকা আর বেঁচে থাকা। এরকম অন্যায্য সিদ্ধান্তে মিলের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষেরা আজ বাস্তবিকই দিশেহারা। রাষ্ট্রয়ত্ব মোট চিনিকলের সংখ্যা ১৫টি। এরমধ্যে বৃটিশ আমলে ৩টি, পাকিস্তান আমলে ৯টি এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ৩টি গড়ে ওঠে। চিনিকলগুলোতে উৎপাদিত চিনি খাদ্য নিরাপত্তা, বাজার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ

● ৭ এর পাতায় দেখুন

চিনিকল শ্রমিকদের রেলপথ অবরোধ

সাম্যবাদ

লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

আয়ে সংসার চালাতে পারে, তা দেখার দায়িত্ব ছিল সরকারের। সেজন্য এসময় প্রয়োজনীয় ছিল, শ্রমজীবি জনগণের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করা, টিসিবি (ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ) কে সক্রিয় করা, কঠোরভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাতে ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনগণকে আরো বিপর্যস্ত করতে না পারে। অথচ এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করতে পারেনি।

রেডিও-টেলিভিশনে, সেমিনারে সরকারের মন্ত্রীবর্গ জনগণকে আশ্বাসবাণী বিতরণ করছেন। এই দাম কমল বলে, সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছেন, দাম কমে যাবে। কোন মন্ত্রী আবার জনগণকে কম কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন, তাহলেই নাকি দাম কমে যাবে। পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি কমানোর পন্থা হিসেবে তো খাদ্যমন্ত্রী একবার জনগণকে পেঁয়াজ না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং পেঁয়াজ ছাড়া তিনি কতপ্রকারের রান্না করতে পারেন, তাও গর্বভরে শুনিয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী এক মাসের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কমে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। জনগণের সব মনে আছে! মন্ত্রীরা মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে কখনো করোনা, কখনও বন্যাকে দায়ী করছেন। পাইকার-আড়তদার-আমদানীকারক-খুচরা ব্যবসায়ীরা কখনো বন্যা, কখনও 'যোগান কম', কখনও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, কখনও পরস্পরের উপর মূল্যবৃদ্ধির দায় চাপাচ্ছেন। বাস্তব চিত্র কি বলে?

বাজার কি স্বাধীন?

সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই মুক্তবাজারের মহিমাকীর্তন করেন। তারা বলেন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজার স্বাধীন, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারণ হবে। কিন্তু আমরা দেশের বাজারে কি দেখছি? বাজার কি সত্যিই স্বাধীন? যোগান কম থাকলে দাম বাড়ার কথা। বাজারে কি যোগান কম আছে? দেশে আলু, চালের তো ঘাটতি নেই! সরকার বলছে, যথেষ্ট চাল মজুদ আছে। বাংলাদেশ পৃথিবীতে আলু উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে সপ্তম। আলু উদ্বৃত্ত আছে। গত মৌসুমে আলু উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৯ লাখ টন। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, দেশে আলুর বার্ষিক চাহিদা ৬৫ লাখ টন। যোগান তো আছে, তাহলে দাম বাড়লো কেন? চলতি বছরের উৎপাদন মৌসুমে কৃষকরা প্রতি কেজি আলু বিক্রি করেছেন ১২-১৫ টাকায়। সেই আলু কিনে মজুদ করেন হিমাগার মালিক ও ব্যবসায়ীরা। কৃষকদের পক্ষে হিমাগারের ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। সে আলুর দাম বাজারে ৫৫ টাকা দরে কিনতে হয়েছে, ৪৫ টাকার নিচে নামছেই না। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে প্রতি কেজি আলু উৎপাদন খরচ হয় ৮ টাকা ৩২ পয়সা। মৌসুমের ক্রয়মূল্য, হিমাগার ভাড়া ও অন্যান্য সব খরচ মিলিয়ে হিমাগার থেকে প্রতি কেজি আলুর দাম পড়ে ১৮ টাকা ৯৯ পয়সা। প্রতি কেজিতে ৪ টাকা মুনাফা ধরে সরকার অক্টোবরে আলুর দাম নির্ধারণ করে দেয় ২৩ টাকা। শতাংশের হিসেবে প্রায় ২১ শতাংশ মুনাফা। কিন্তু হিমাগার মালিকরা ও মধ্যস্বত্বভোগীরা এ মুনাফায়ও খুশি হয়নি। তাদের চাপে সরকার অক্টোবরের শেষে হিমাগার গেইটে আলুর দাম বেঁধে দেয় কেজিপ্রতি সাতাশ টাকা। প্রতি কেজিতে আট টাকা মুনাফা, শতাংশের হিসাবে প্রায় ৪২ শতাংশ মুনাফা। এরপরও বাস্তবে বাজারে আলুর দাম ৫০-৫৫ টাকা। এ যে ডাকাতি! "সবমিলিয়ে এই সিন্ডিকেট আলু থেকেই কয়েক হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর ২০২০)। সরকারী বেঁধে দেওয়া দামকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা জনগণের পকেট থেকে লুটে নেওয়ার পরও, না কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো, না সরকার আলুর দাম কমাতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করতে পারলো!

আরেক তেলেসমাতি কারবার হচ্ছে পেঁয়াজ নিয়ে। দেশে বছরে পেঁয়াজের চাহিদা প্রায় ২৫ লাখ টন। চলতি বছর এর বেশি উৎপাদন হয়েছে। তবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ২০-২৫ শতাংশ নষ্ট হয়। ফলে প্রকৃত উৎপাদন ১৯ লাখ টনের বেশি। বাকি ৬ লাখ টন আমদানি করতে হয়। গত বছরের শেষদিকে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিলে, পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ২৫০-৩০০ টাকা ছুঁয়েছিল। এবার সেপ্টেম্বরে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার পরপরই, একই কায়দায় পেঁয়াজের দাম রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া হল। সরকার তখন ভারত ছাড়া অন্যান্য ৮টি দেশ থেকে ব্যবসায়ীদের প্রায় ৬ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বলেছিলেন, একমাসের মধ্যে পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হবে। অক্টোবরে নেদারল্যান্ড, মিশর, পাকিস্তান, চীন ও মিয়ানমার থেকে প্রচুর পেঁয়াজ এসেছে। অর্থাৎ পেঁয়াজের ঘাটতি নেই। তাহলে দাম কমছে না কেন? এর পেছনে আছে পেঁয়াজের শক্তিশালী সিন্ডিকেট। পত্রিকায় এসেছে – চট্টগ্রাম, হিলি, সোনামসজিদ, ভোমরা ও টেকনাফ স্থলবন্দরের ৬০ জনের সিন্ডিকেট পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে, প্রতিদিন গড়ে ৬ হাজার টন পেঁয়াজের চাহিদা আছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের হিসেবে বাজারে প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াই হাজার টন পেঁয়াজ বিক্রি হয়। সেই হিসেবে একদিনেই অতিরিক্ত দাম নেয়ার মাধ্যমে ভোক্তাদের পকেট হতে প্রায় ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা (দৈনিক ভোরের ডাক, ১৬ সেপ্টেম্বর–২০২০)। এভাবে গত ২ মাসে (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর) প্রায় ৬০০ কোটি টাকা জনগণের পকেট থেকে লুটে নিয়েছে পেঁয়াজ সিন্ডিকেট।

সব ধরণের চালের দামও বাড়ছেই। টিসিবি বলছে, গতবছরের তুলনায় মোটা জাতের চাল ৪১.১৮% বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। সরকার প্রতি কেজি উৎকৃষ্টমানের মিনিকেট চাল পাইকারি বাজারে ৫১ টাকা ৫০ পয়সা ও মাঝারি মানের মিনিকেট চাল ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে দেয়। অথচ বাজারে উৎকৃষ্ট মিনিকেট পাইকারি ৫৫ টাকা, খুচরা পর্যায়ে ৬০-৬৫ টাকার নিচে নেই। নিম্নমানের মিনিকেট পাইকারি ৫০ টাকা, খুচরা ৫৫ টাকার নিচে নামছে না।

সিন্ডিকেট বলে কি কিছু নেই ?

জনগণ পরিষ্কার বোঝে ও জানে, এ মূল্যবৃদ্ধি একটা শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারসাজি এবং এ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ। অথচ ২০১৯ সালে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সিন্ডিকেট বলে আসলে কিছু আছে এমন মনে করেন না বলে জানিয়েছিলেন। অথচ, খাদ্যপণ্যের সিন্ডিকেট নিয়ে দৈনিক বণিকবার্তার একটি রিপোর্ট (২১ নভেম্বর ২০১৯) দেখাচ্ছে – "চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণত কুষ্টিয়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের ১২-১৫ জন বড় চালকল মালিক। আমদানিনির্ভর ভোজ্য তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ভিত্তিক ৫ থেকে ৭টি পরিশোধন কারখানা। একই এলাকার ৮-১০টি পরিশোধন কারখানা নিয়ন্ত্রণ করে চিনির বাজার।. .. চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী... ঢাকার মৌলভীবাজারের পাইকারী ব্যবসায়ী...এই দুই বাজারের ২০-২৫ জন আমদানিকারক মূলতঃ মসলার বাজারে কর্তৃত্ব করেন।" আরেকটি পত্রিকায় এসেছে, সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড এ পাঁচটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে ভোজ্য তেলের বাজার।

জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ ও পত্রপত্রিকায় সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের নাম উল্লেখসহ প্রচুর রিপোর্ট আসায় সম্প্রতি জনাব ওবায়দুল কাদের বাধ্য হয়ে বলেছেন- "দেখুন, একটা সিন্ডিকেট সবসময় কাজ করে। সিন্ডিকেটের কাছে হেরে যাওয়া কথাটা ঠিক নয়। সরকার সিন্ডিকেট ভাঙতে কাজ করছে।" সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য সরকার কি কি কাজ করছে? কারা সিন্ডিকেট করছে, নামসহ পত্রপত্রিকায় এসেছে। সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য কাজ করলে, দাম কমছে না কেন? এখন পর্যন্ত সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত কোন ব্যবসায়ী, কোন অবৈধ মজুতদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? হয়নি। সরকার আলু-চালের দাম কয়েকবার বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা পাত্তা দেয়নি। কারণ তারাও জানে, সরকারের সব তৎপরতা হুমকি-ধামকি পর্যন্তই।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশে কিছু আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। প্রতিযোগিতা আইনে বলা আছে – পণ্য বা সেবার ক্রয়বিক্রয়-মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করলে, উৎপাদন-সরবরাহ-বাজার সীমিত করলে তা প্রতিযোগিতার পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য গতবছর প্রতিযোগিতা কমিশনও গঠিত হয়েছে। কিন্তু লোকবল নিয়োগ না দেয়ায়, সে কমিশন কার্যত ঢাল-তলোয়ার ছাড়া নিধিরাম সর্দারের দশায় আছে। যদিও কমিশনের চেয়ারপারসন মফিজুল ইসলাম বলেছেন, তারা কঠোর হবেন। বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতা হলে, কমিশন আইন প্রয়োগ করছেন। (কালের কণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০২০) কিন্তু তার দাবি অনুযায়ী, 'আইন প্রয়োগ করছেন' এমন উদাহরণ দেখা যায়নি। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(১) ধারা অনুযায়ী কেউ মজুদদারি বা কালোবাজারে লেনদেনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আজীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছরের কারাদন্ড হতে পারে। অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন (Control Of Essential Commodities Act 1956) এ বলা আছে লাইসেন্স ছাড়া কোন ব্যবসায়ী ১ টনের বেশি খাদ্যশস্য মজুদ করতে পারবে না। চাল বা ধান পাইকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৩০০ টন ও সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য মজুদ করা যাবে। ব্যবসায়ীরা আমদানি পণ্যের শতভাগ সর্বোচ্চ ৩০ দিন মজুদ রাখতে পারবেন, ৫০ শতাংশ পণ্য ৪০ দিন ও ২৫ শতাংশ পণ্য ৫০ দিন মজুদ রাখতে পারবেন। এ আইন অনুযায়ী ১৫ দিন অন্তর চালকল মালিকরা তাদের গুদামে মজুদের পরিমাণ ছক আকারে সরকারকে জানানোর কথা। মুক্তবাজারের দোহাই দিয়ে ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকার খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ও সময়সীমা সংক্রান্ত আদেশ স্থগিত করে। ২০১১ সালে ১৯৫৬ সালের আইনটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু প্রচুর হাঁকডাক দিয়েও এ আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। ফুড(স্পেশাল কোর্টস) এ্যাক্ট-১৯৫৬ অনুযায়ী কন্ট্রোল অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিস এক্ট-১৯৫৬ এর ধারা লঙ্ঘন করলে ফুড কোর্ট বা খাদ্য আদালত গঠনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার কথা। কিন্ত এর কোনটাই বাস্তবায়ন করা হয়নি।

টিসিবি(ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ)-র মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘদিনের দাবি। সরকারও বলে – আমরা টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি শুরু করেছি, শীঘ্রই দাম কমবে। অথচ টিসিবির সে সক্ষমতাই তৈরি করা হয়নি। মাত্র ২৭৫ জন জনবল, চাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা-রাজশাহী এ চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়, মাত্র ৬ হাজার ৮৪০ টন ধারণক্ষমতার পণ্যগুদাম দিয়ে অল্প কিছু স্পটে কিছু পণ্য বিক্রি করে কিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? ভোগ্যপণ্যের বড় অংশ আমদানিনির্ভর, যা ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে। টিসিবি দেশের মোট আমদানির মাত্র ০.৩০ ভাগ আমদানি করে। এ যেন সাগরে একবিন্দু জলের মতো। টিসিবি যে আমদানি করবে, সে অর্থ বরাদ্দই সরকার করছে না। টিসিবির অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করে সংসদে বিল পাশ হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু এখনও সে অর্থ বরাদ্দ হয়নি। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এসটিসি) ও পাকিস্তানে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ পাকিস্তান (টিসিপি) বাজার নিয়ন্ত্রণসহ বছরে হাজার কোটি টাকা মুনাফা করে। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য টিসিবিকে একটা কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেত। কেন তা করা হচ্ছে না?

কেন বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না?

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ গত ডিসেম্বরে একটা সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, "একটা কথা হয় সিন্ডিকেট। আমি ১০ বছর মন্ত্রী ছিলাম। আসলে সিন্ডিকেট বলে কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। এটা একটা তথ্য সিন্ডিকেট। ব্যবসায়ীরা আমাদের বন্ধু। আজকের মিটিংয়েও আমি বলেছি, ধরপাকড়, জবরদস্তি করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সবাইকে আপন করে নিয়ে সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে সমস্যার সমাধান করব।" (বার্তা ২৪, ১ ডিসেম্বর ২০১৯) কিছুদিন আগে একটি পত্রিকাকে তিনি বলেন, "মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জোরপূর্বক বাজার নিয়ন্ত্রণ করা করা যাবে না। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে 'সতর্কতার কিছুটা অভাব' তিনি দেখছেন বলে মত দেন তোফায়েল আহমেদ"(কালের কণ্ঠ, ১২ অক্টোবর, ২০২০)।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বক্তব্যেই স্পষ্ট, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিলেও, কেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তারা 'সরকারের বন্ধু'। টিআইবির রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে সংসদের ৬১ শতাংশই ব্যবসায়ী। সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা অধিকাংশই ব্যবসায়ী, তারাই রাষ্ট্র চালায়। অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনসমর্থনহীন আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবসায়ীদের তুষ্ট রাখতে চায়। ব্যবসায়ীরাও জানে সরকার কোন কড়া পদক্ষেপ নেবে না, বাজার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত হাঁকডাক হলো আমজনতাকে শান্ত রাখার জন্য।

সমাধান কি?

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ কি? উপরের আলোচনাতেই তা উঠে এসেছে। দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে জিনিসপত্র উৎপাদন হয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। সে মালিক ব্যক্তিও হতে পারে, রাষ্ট্রও হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়, পুঁজিবাদী দেশে তেমন হয় না। জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, সর্বোচ্চ মুনাফার জন্যই এখানে উৎপাদন নীতি ও উৎপাদন পরিচালিত হয়। ফলে মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। মালিকের শোষণের ফলে শ্রমিকসহ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। আয়ের সাথে ব্যয়ের তাল মেলাতে না পারায়, জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে, মূল্যবৃদ্ধির সংকট হতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নিস্তার নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও সরকার মূল্যবৃদ্ধি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এ দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। এজন্য মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, মজুতদার-কালোবাজারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, পাইকারি ও খুচরা বাজারে সরকার ও প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি করা এবং ন্যায্যমূল্যে যাতে জনগণ খাদ্যপণ্য কিনতে পারে তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। এর সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো – খাদ্যপণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের দেশে এ পুরো ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা। কৃষক অল্প দামে পাইকার, আড়তদার, হিমাগার মালিক, চালকলমালিক, ফড়িয়া এধরণের মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় না এবং অতিরিক্ত দামে জনগণকে তা কিনতে হয়। যেসব খাদ্যপণ্য আমদানিনির্ভর, তার দামও নির্ভর করে আমদানিকারকদের উপর। খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ হতে সরকারী ক্রয়কেন্দ্র-এজেন্সির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য কিনে নিবে এবং যেক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদেশ থেকে আমদানি করবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সে খাদ্যশস্য বিভিন্ন সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবে। খাদ্যপণ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো কম দামে কৃষকদের কাছ হতে খাদ্যশস্য কিনতে পারবে না, ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে দিতে পারবে না। এর ফলে একদিকে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে, অন্যদিকে জনগণ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হতে রেহাই পাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ব্যবস্থা প্রবর্তন কি সম্ভব?

আশি-র দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, এমনিক পাড়ায় পাড়ায় 'রেশন শপ' চালু ছিল। সেগুলোতে চাল, ডাল, তেল, চিনি, চাপাতা, এমনকি সাবান পর্যন্ত সরকার নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যেত। টিসিবির মাধ্যমে খাদ্যপণ্য আমদানির সিংহভাগ হতো। নব্বই দশক হতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ মুক্তবাজার বা উদার অর্থনীতি গ্রহণের জন্য অনুন্নত দেশগুলোকে চাপ দিতে থাকে। তারা বললো – বাজার মুক্ত কর, বাজারে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ চলবে না, কোন্ জিনিস কী দামে বিক্রি হবে – বাজারই তা ঠিক করবে, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না ইত্যাদি। আমরা দেখলাম, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে ব্যবসায়ীদের জন্য বাজার খুলে দিতে তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে খাদ্যে রেশনিং ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। 'মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর' বিলুপ্ত ও টিসিবির কার্যক্রম একেবারে গুটিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তী সরকারগুলো এ দাওয়াই বাস্তবায়ন বহাল রাখে। আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ায় ভারতীয় চিনিতে বাজার সয়লাব হল, অন্যদিকে দেশীয় চিনিকল ও আখচাষীরা ক্রমাগত লোকসানে পড়ল। এর ফল হলো, বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠে গিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলো। এখন তাদের ইশারাতেই বাজার উঠ-বস করে। একারণেই চাহিদা-যোগানের ভারসাম্যে দাম নির্ধারিত হবে, বাজারকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে – বুর্জোয়া অর্থনীতির এ তত্ত্বের বড় প্রচারক ও সুবিধাভোগী এ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা।

টিসিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য ক্রয় ও আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এ মূহুর্তেই বাজারের ২০-৩০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন নয়। সারাদেশের সমস্ত ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে টিসিবির মাধ্যমে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করলে সিন্ডিকেটের চাপিয়ে দেয়া কৃত্রিম দাম কমতে শুরু করবে। এরপর ধাপে ধাপে সারাদেশে স্থায়ী সরকারি ক্রয়কেন্দ্র ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে খাদ্যশস্য উৎপাদন, ক্রয়, সরবরাহ, বন্টন ব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ সক্ষমতা যত বাড়বে, তত বাজারের উপর মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সরকারের নানা প্রতিষ্ঠান তো দুর্নীতিগ্রস্ত, টিসিবির নানা দুর্নীতির খবর তো পত্রিকায় আসে। এজন্য আমাদের দাবি, টিসিবিসহ সরকারি এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভোক্তা ও জনগণের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিনিধি রাখতে হবে, নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রশ্ন হলো 'ব্যবসায়ীদের বন্ধু সরকার' কি জনগণের স্বার্থে এ পদক্ষেপগুলো নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে? পুঁজিপতিদের সমর্থনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে, তারা নাখোশ হবে, এমন পদক্ষেপ কি তারা গ্রহণ করবে? এজন্যই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য করতে চাই – ভুক্তভোগী জনগণের সংগঠিত গণআন্দোলন। বাঁচতে হলে সে আন্দোলনে আজ সবাইকে সামিল হতে হবে।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে লেনিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

অস্ত গিয়াছে প্রজ্ঞাদীপ্ত যুক্তির প্রভাকর
মহান হৃদয় স্পন্দনহারা স্তম্ভিত চরাচর
(এন এ নেক্রাসভের কবিতার দুটি লাইন)

১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট (নতুন গণনারীতি অনুসারে) লন্ডনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের জীবনাবসান ঘটে। ১৮৮৩ সালে প্রয়াত তাঁর বন্ধু কার্ল মার্কসের পরে তিনিই ছিলেন সমগ্র সভ্য দুনিয়ার আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহত্তম মনীষী ও শিক্ষক। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস – একই চিন্তাধারার অধিকারী এই দুই ব্যক্তিত্ব যেদিন ঘটনাচক্রে পরস্পর মিলিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অভিন্ন এক লক্ষ্যে অটুট বন্ধুত্বে এঁদের আজীবন অবিচল যাত্রার সূচনা হয়েছিল। এবং সেজন্যই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের অবদান সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সমসাময়িক কালের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের শিক্ষা ও কর্মধারার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে।

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দেখান যে, প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের দাবিদাওয়াগুলির জন্ম হয়েছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অনিবার্যভাবে বুর্জোয়াশ্রেণির জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে সর্বহারাশ্রেণিরও জন্ম দেয় ও তাকে শিল্পভিত্তিতে একত্রিত করে দেয়। তাঁরা দেখান যে, কিছু মহৎ হৃদয় মানুষের শুভ কর্মপ্রচেষ্টা মানবসমাজকে বর্তমান শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না – সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামই একমাত্র এই মুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারধারার মাধ্যমে দেখালেন যে, সমাজতন্ত্র স্বপ্নবিলাসীদের কোনও কাল্পনিক উদ্ভাবন নয়, আধুনিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চূড়ান্ত ও অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতিই হল সমাজতন্ত্র। আমাদের জানা(রেকর্ডেড) মানসবসমাজের এতাবৎকালের সমগ্র ইতিহাসই হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস – পর্যায়ক্রমে সমাজে কিছু শ্রেণির শাসন এবং তার বিরুদ্ধে শাসিত অপর কিছু শ্রেণির সংগ্রাম ও জয়লাভের ইতিহাস। এই সামাজিক প্রক্রিয়া ততদিন চলতে থাকবে, যতদিন সমাজের বুক থেকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিপ্রভুত্বের মূল ভিত্তি ব্যক্তিসম্পত্তি ও বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যমূলক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান না ঘটবে। শোষণ-নিপীড়নের এই সামাজিক ভিত্তিগুলির ধ্বংস ছাড়া সর্বহারাশ্রেণির স্বার্থ পূরিত হতে পারে না এবং সে কারণেই সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণির সচেতন শ্রেণিসংগ্রামকে এই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। এবং প্রতিটি শ্রেণিসংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

বিশ্বব্যাপী যে সর্বহারাশ্রেণি মুক্তির জন্য লড়ছে, তারা সকলেই মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বিচারধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের লড়াইয়ের মূল আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যখন এই দুই বন্ধু তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন ও তদ্গত রূপরেখাটি রচনার সংগ্রামে লিপ্ত হন, তখন তাঁদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সকলের কাছেই আশ্চর্য রকমের নতুন বলে মনে হয়েছিল। সেদিন রাজার স্বৈরশাসন, পুলিশ ও পুরোহিতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বহু মানুষই লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাধারণ মেধার মানুষ যেমন ছিলেন, অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষও ছিলেন। সৎ, ন্যায়পরায়ণ মানুষের পাশাপাশি অসৎ-মতলববাজরা ছিল। কিন্তু তাঁদের কেউই, বুর্জোয়াশ্রেণি ও সর্বহারাশ্রেণির পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের সত্যটি ধরতে পারেননি। এঁরা ভাবতেই পারতেন না যে, শ্রমিকরা একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে সমাজে কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে। বরং এঁদের মধ্যে এমন অনেক কল্পনাবিলাসী ছিলেন – যাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাধর বলেও খ্যাত – যাঁরা মনে করতেন প্রচলিত সমাজের অন্যায়-বৈষম্য সম্পর্কে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণিগুলিকে বুঝিয়ে তাদের হৃদয় পরিবর্তন করাই আসল কাজ, তাহলেই পৃথিবীর বুকে শান্তি ও সর্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। এঁরা এমন এক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা সংগ্রাম ছাড়াই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেই সময় সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকশ্রেণির বন্ধু বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় সকলেই সাধারণভাবে সর্বহারাদের সমাজের 'ক্ষত' বলেই মনে করলেন এবং শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কী করে যে সর্বহারাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে যাচ্ছে, তা ভেবেই তাঁরা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হলেন। ফলে, কীভাবে শিল্পের ও সর্বহারার বিকাশ বন্ধ করা যায়, প্রায় সকলেই তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। 'ইতিহাসের চাকা' কীভাবে থামিয়ে দেওয়া যায় এই ভাবনা তাঁদের পেয়ে বসল। মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু এই উদ্বেগ ও আতঙ্কের আদৌ শরিক হলেন না, বরং সর্বহারাশ্রেণির নিরন্তর বিকাশের উপরই তাঁদের সকল আশা-ভরসা তাঁরা ন্যস্ত করলেন। শ্রমিকশ্রেণির মুক্তিসংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান অবদান ও ভূমিকাকে এক কথায় এইভাবে রাখা যায় : তাঁরা শ্রমিকদের শ্রেণি হিসাবে নিজেদের চিনতে ও নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শিখিয়েছেন। স্বপ্ন ও কল্পনার জায়গায় তাঁরা বিজ্ঞানকে স্থাপনা

(এই নিবন্ধটি লেনিন ১৮৯৫ সালে লেখেন। 'রাবোস্টনিক' পত্রিকায় ১৮৯৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। লেনিন রচনাবলী ২য় খণ্ড, মস্কো-১৯৬০। এ বছর ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা ও শিক্ষক ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের দ্বি-শততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই অনবদ্য প্রবন্ধটি সামান্য সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত হল।)

করেছেন। এ কারণেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের সঙ্গে প্রতিটি শ্রমিকের পরিচিত হওয়া অবশ্যপ্রয়োজন। তাই এই নিবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহান দুই শিক্ষকের একজন – এঙ্গেলসের জীবন ও কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সকল প্রকাশনার মতোই এই নিবন্ধেরও উদ্দেশ্য – রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা জাগ্রত করা।

এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০ সালে প্রুশিয়ার রাইনে প্রদেশের বারমেনে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ম্যানুফ্যাকচারার। ১৮৩৮ সালে, হাইস্কুলের পড়া শেষ করার আগেই এঙ্গেলসকে পারিবারিক অবস্থার চাপে ব্রেমেনে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে কেরানির চাকরি নিতে হয়। কিন্তু সওদাগরি অফিসের কাজকর্ম এঙ্গেলসের কাছে বিজ্ঞান ও রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারেনি। হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই এঙ্গেলসের মনে স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসন ও আমলাতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মেছিল। দর্শনগত অধ্যয়ন তাঁর রাজতন্ত্রবিরোধিতাকে আরও গভীর করল। ওই সময় জার্মানিতে দর্শনচর্চার জগতে হেগেলের চিন্তার প্রভাব ছিল প্রবল। এঙ্গেলস ওই হেগেলরই অনুগামী হলেন। হেগেল নিজে যদিও প্রুশীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে প্রুশীয় রাষ্ট্রেরই কর্মচারী ছিলেন, তথাপি হেগেলের শিক্ষাগুলি ছিল বৈপ্লবিক উপাদানে সমৃদ্ধ। মানুষের যুক্তিবাদী মননশীলতার প্রতি হেগেলের আস্থা, যুক্তি দিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝে নেওয়ার মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং হেগেলীয় দর্শনের যেটা মূল সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিবর্তন ও বিকাশের এক নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে – এই সমস্ত কিছুই হেগেলের কতিপয় অনুগামীকে – যাঁরা কোনও ভাবেই প্রচলিত অবস্থাকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না – এক নতুন ভাবনায় পৌঁছে দিল। হেগেলের দর্শনগত মূল সিদ্ধান্তকে ধরেই তাঁরা বললেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ অনন্তকাল ধরে পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে – এ সার্বজনীন নিয়মের মধ্যেই তো নিহিত আছে বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, প্রচলিত সমাজের অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সার্বজনীন সত্যটি। এই বিশ্বের সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ও বিকাশ হচ্ছে, এটাই যখন সার্বজনীন নিয়ম, এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিকাশের ধারাবাহিকতায় এক সময়ে এসে অন্য এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয় – এই যখন পরিবর্তনের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া, তখন প্রুশিয়ার রাজা বা রাশিয়ার জারের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিরকাল বহাল থাকবে কেন? গরিষ্ঠ জনসমষ্টির স্বার্থকে বিকিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কেন মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মানুষ বিত্তশালী হবে অথবা জনসাধারণের উপর চিরকাল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেন? হেগেলের দর্শন মানুষের মননের ও তার বিভিন্ন ভাবনা-ধারণার (আইডিয়া) বিকাশের ধারা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়েছে, কিন্তু তা ভাববাদী ব্যাখ্যা। মনন ও ভাবের বিকাশের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, তাকেই নিয়ামক ধরে হেগেলীয় দর্শন প্রকৃতিজগৎ, মানুষ এবং মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশ সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত করেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস, হেগেলীয় দর্শনের চিরন্তন বিকাশের নিরন্তর প্রক্রিয়ার ধারণাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু হেগেলের পূর্বধারণাভিত্তিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত (অর্থাৎ, ভাবের নিয়ামক ভূমিকাকে-অনুবাদক) বর্জন করলেন, বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা দেখলেন, মনন বা ভাবের বিকাশ দিয়ে প্রকৃতিজগতের বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বরং প্রকৃতিজগৎ তথা বাস্তবজগতের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই একমাত্র মননের বা ভাবের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। হেগেল ও অন্যান্য হেগেলপন্থীরা ছিলেন ভাববাদী, মার্কস ও এঙ্গেলস হলেন বস্তুবাদী। তাঁরা বিশ্ব ও মানবসমাজকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলির পিছনে যেমন বস্তুগত কারণ কাজ করছে, ঠিক তেমনভাবেই মানবসমাজের বিকাশও বস্তুগত নানা শক্তি তথা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল (কন্ডিশন্ড)। মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উৎপাদন করতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে কী সম্পর্কে আবদ্ধ হবে, তা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। এবং উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে-মানুষে এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, তার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের সামাজিক জীবন, মানবিক আশা-আকাঙ্খা, ভাবনা-ধারণা ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের যাবতীয় ব্যাখ্যা। এখন সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তির উপর যেসব সামাজিক সম্পর্কগুলি আমরা দেখছি, তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে, উৎপাদিকা শক্তির একই বিকাশ আবার সমাজের গরিষ্ঠ জনসমষ্টিকে তাদের নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে এবং সেই সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করছে নগণ্য সংখ্যক মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। উৎপাদিকা শক্তির এই বিকাশই আধুনিক সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি ব্যক্তিসম্পত্তিকে অবলুপ্ত করবে, এই বিকাশই সম্পত্তি বিলোপের সেই অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাইছে – যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনে সমাজতন্ত্রীরা তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে। এখন সমাজতন্ত্রীদের সর্বপ্রথম যেটা বুঝে নিতে হবে, তা হল, কারা সেই সামাজিক শক্তি, যারা আধুনিক সমাজে তাদের বিশেষ অবস্থানের জন্যই সমাজতন্ত্র কায়েম করতে আগ্রহী। এরপর যা করতে হবে তা হল, এই বিশেষ সামাজিক শক্তির মধ্যে তাদের নিজ শ্রেণিস্বার্থবোধ সম্পর্কে, তাদের ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে। সর্বহারা শ্রেণিই হল এই সামাজিক শক্তি। ***চলবে***

সাপ্তাহিক গণদাবী : ৭২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা থেকে নেয়া

কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু

ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়ে না। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে লোক দেখানো কিছু পদক্ষেপ নিলেও কোনও ঘটনারই বিচার হয় না। এর আগে ২০১৬ সালে এই কুমিল্লার নাসিরনগরে হামলার ঘটনায় বিচার হয়নি, ২০১২ সালে কক্সবাজারে বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায়ও বিচার হয়নি। বিচারহীনতার কারণে ক্রমাগত এই ধরণের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা বাড়ছে।" বিবৃতিতে তিনি বলেন, ' সমাজে মানুষের মধ্যে দিন দিন ধর্মান্ধতা, যুক্তিহীন আচরণ ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব বাড়ছে। শাসকশ্রেণী মুখে গণতন্ত্রের তুবড়ি ছোটালেও একটা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। বরং যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল তাকে বিপন্ন করেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার খোলসে অগণতান্ত্রিক-গণবিরোধী-স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। দেশের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রহীনতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতা সমাজমননেও প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক-গণবিরোধী-স্বৈরাচারী শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে স্বয়ং সরকার বিভিন্ন ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে মদদ জোগাচ্ছে। মুরাদনগরে পুলিশের সাথে একটি সভা থেকে উঠে গিয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পুলিশের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তাই তার প্রমাণ।"

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, 'আমরা মনে করি, একজন নাগরিক সামাজিক-রাজনৈতিক যেকোন বিষয়ের মতো ধর্মীয় বিষয়েও মত প্রকাশ করতে পারেন। তার মতামত কারো ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এজন্য তার ওপর হামলা করা যায় না। কারো পছন্দ না হলে তার মতামতের সমালোচনা, নিন্দা এমনকি প্রতিবাদ কর্মসূচি করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ভুল বা অন্যায় কথাও বলে, তাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়ার জন্য তার বাড়িঘরে হামলা করার অধিকার কারো নেই। অন্যদিকে যেকোনো নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের দায়িত্ব । কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকার হেফাজতে ইসলামসহ মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাত ও আপোস করছে এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।" কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি এবং এই শক্তিকে লালন-পালন ও প্রশ্রয়দানকারী শাসকদল আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, রেশন

দেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার নেতা জিএম বাদশা ও রহিমা আক্তার কলি প্রমুখ।

কেন্দ্র ঘোষিত 'দাবি মাস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ নভেম্বর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং সারাদেশে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, নাঈমা খালেদ মনিকা, মাসুদ রানা, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের পর একটি মিছিল পল্টন-গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে। দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল শেরেবাংলা নগরস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "করোনা ভাইরাসে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিপর্যস্ত। সংক্রমণ মোকাবেলায় ব্যর্থ সরকার জনগণকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা মরার মরবে ও যারা বাঁচার বাঁচবে। ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো প্রধান শহরেই বেশিরভাগ হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই-এর মতো প্রাথমিক জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা নেই, আইসিইউ-এর জন্য হাহাকার তৈরি হয়েছে। দুই মাস লকডাউনেই দেশের বেশিরভাগ পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে, অর্থাৎ কাজ বন্ধ থাকলে অল্প কিছুদিন চলবার মতো সঞ্চয় নেই বেশিরভাগ মানুষের। করোনাজনিত অর্থনৈতিক মন্দার অজুহাতে ছাঁটাই-বেতন কর্তন চলছে, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বাড়ছে। প্রবাসীরা অনেকে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে আসছেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ করে দিয়ে ৬০ হাজার শ্রমিককে এক ধাক্কায় বেকার করে দিয়েছে, পাটচাষীদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভুতুড়ে বিদ্যুৎবিলের বোঝা, বর্ধিত পানির বিল-গাড়িভাড়ায় মানুষ দিশাহারা।

শোষণমুক্তির চেতনায় সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরুন
মৌলিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জীবন-জীবিকার দাবিতে জেলায় জেলায়

রুশ বিপ্লব এবং বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাইবান্ধাঃ মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকী এবং দলের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলার উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর সকাল ১১টায় শহীদ মিনারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার আহবায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দীন কবীর আতিক, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য জহিরুল ইসলাম, জেলা কমিটির সদস্য গোলাম সাদেক লেবু, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী। সভা শেষে সহস্রাধিক জনতার মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ঢাকাঃ বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ১৩ নভেম্বর বিকাল ৪টায় নগরের পল্টন, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, প্রেসক্লাব এলাকায় লাল পতাকা মিছিল ও মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নগরের ইনচার্জ নাঈমা খালেদ মনিকা সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সভা পরিচালনা করেন নগর শাখার সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য্য।

সিলেটঃ দলের সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীর কোর্ট পয়েন্টে ৭ নভেম্বর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়, বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য মুখলেছুর রহমান। সমাবেশ শেষে জনজীবনের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, লালপতাকা সহ সুসজ্জিত মিছিল কোর্ট পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে আম্বরখানা পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।

যশোরঃ ১৩ই নভেম্বর যশোরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকী ও বাসদ(মার্কসবাদী)র ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা গোলাম মোস্তফার পরিচালনায় ও জেলা সমন্বয়ক হাসিনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জল রায়। সভা শেষে লাল পতাকা সুসজ্জিত একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রংপুরঃ দলের জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ নভেম্বর লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টির রংপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন রংপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আহসানুল আরেফিন তিতু, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলার দপ্তর সম্পাদক কামরুন্নাহার শিখা, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক শাহিদুল ইসলাম সুমন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক সাজু রায়। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলার সদস্যসচিব সুরেশ বাসফোর।

সাতক্ষীরাঃ ১২ নভেম্বর সাতক্ষীরায় মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকী ও বাসদ(মার্কসবাদী)র ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সাতক্ষীরা জেলা শাখার আয়োজনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জল রায়, জেলা শাখার নেতা চিত্তরঞ্জন সরকার, অ্যাড. খগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

নোয়াখালীঃ নোয়াখালীতে ৭ নভেম্বর শনিবার সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদমিনার চত্বরে জীবন-জীবিকার অধিকার, মনুষ্যত্ব-মর্যাদা রক্ষা ও মানবমুক্তির লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও গান,আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেনপার্টি জেলা ফোরামের সদস্য বিটুল তালুকদার, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সংগঠক দীপন মজুমদার, সুমন দাস, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সংগঠক মুনতাহার প্রীতি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পার্টি জেলা ফোরামের সদস্য আনোয়ারুল হক পলাশ।

ময়মনসিংহঃ মহান রুশ বিপ্লবের ১০৩তম এবং বাসদ(মার্কসবাদী)-র ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমন্বয়ক শেখর রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার নেতা আলাল মিয়া প্রমুখ।

চট্টগ্রামঃ ১৩ই নভেম্বর দলের চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলের জেলা সদস্য সচিব শফিউদ্দিন কবির আবিদের সভাপতিত্বে ও জেলা ফোরামের সদস্য জাহেদুন্নবী কনকের সঞ্চালনায় আলোচনা করেন জেলা সদস্য ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা।

রৌমারী(কুড়িগ্রাম) ঃ রুশ বিপ্লবের ১০৩ তম এবং বাসদ(মার্কসবাদী)-র ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা পাখিউড়া অঞ্চলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র জেলা সমন্বয়ক মহিউদ্দিন মহির, আক্কাস আলী প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জ ঃ জেলা শাখার পক্ষ থেকে গোবিন্দপুরে জেলা সংগঠক কমরেড আলাল মিয়ার সভাপতিত্বে এবং কমরেড এবায়েদুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলের ময়মন-সিংহ জেলা সমন্বয়ক শেখর রায় ও কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির অন্যতম নেতা মানস নন্দী। আলোচনা সভার পূর্বে গণসংগীত পরিবেশন করে গণসংগীত শিল্পী রাশিদ মিয়া। আলোচনা সভা শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুরঃ মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকী এবং বাসদ(মার্কসবাদী)-র ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গাজীপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি গাজীপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দীন কবির আতিক, জেলা কমিটির সদস্য মাসুদ রেজা, শাহ্ জালাল প্রমুখ। সভায় বক্তরা বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের মাটিতেও আমরা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর নেতৃত্বে শোষণমুক্তির সেই লড়াই করছি। মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসারতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, পুনরায় এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এই মুক্তির সংগ্রাম বেগবান করার জন্য বাসদ (মার্কসবাদী) লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনায় বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে সবাইকে এক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

"ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন- অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ!"

আগামী ৯ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার ১৪০তম জন্মবার্ষিকী ও ৮৮তম প্রয়াণ দিবসে তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ধর্ষণ, নারী-শিশু নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের নারী গণসমাবেশ

সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণ, নারী-শিশু নিপীড়ন ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে এবং নারীর প্রতি সকল বৈষম্য প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে দেশের প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের সামনে ২৭ নভেম্বর বিকাল ৩টায় নারী গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিপিবি নারী সেলের আহ্বায়ক লক্ষ্মী চক্রবর্তী এবং পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু। বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ নারী-মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, শ্রমজীবী নারী মৈত্রীর সভাপতি বহ্নিশিখা জামালী, নারী সংহতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসলিমা আখতার এবং বিপ্লবী নারী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমেনা আক্তার। সমাবেশে বক্তাগণ ধর্ষণ, নারী-শিশু নিপীড়ন ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন বিবেকবান মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করা হয় এবং এ দাবিতে মাসব্যাপী জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হয়।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, রেশন চালু, ধর্ষকদের দ্রুত বিচারসহ ১২ দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালিত

করোনায় দুর্দশাগ্রস্থ গরীব-মধ্যবিত্তের জন্য রেশনব্যবস্থা চালু ও লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, নারী-শিশু ধর্ষণকারীদের দ্রুত বিচার, দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করতে আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত, শ্রমিক ছাঁটাই-বেতন কর্তন বন্ধ, রাষ্ট্রীয় পাটকল চালু, চাষীদের ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ক্রয় বাড়ানো, রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ার-গুম-নির্যাতন বন্ধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিপীড়নমূলক ধারা বাতিল, করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি মওকুফসহ ১২ দফা দাবিতে বাসদ(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। চাঁদপুরে ১ নভেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। মিছিলে নেতৃত্ব

● ৩ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্য সংগ্রহ অভিযান

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্য সংগ্রহ অভিযানঃ বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশে মাসব্যাপী সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। জেলায় জেলায় সদস্য সংগ্রহের খণ্ডচিত্র।

ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় সমাবেশ

গত ১৩ নভেম্বর সিলেটে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সমাবেশে জমায়েতের একাংশ

সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গত অক্টোবর মাসের শুরু থেকে 'ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যানারে বামপন্থী ছাত্র-যুব-নারী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঢাকার শাহবাগে টানা অবস্থান চলে সপ্তাহব্যাপী। সেখান থেকে মহাসমাবেশের পর ১৬-১৭ অক্টোবর ঢাকা-নোয়াখালী লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। লংমার্চে ফেনীতে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও পুলিশ হামলা চালায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস জুড়ে বিভিন্ন বিভাগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এছাড়া ও ৩০ নভেম্বর রংপুর, ১ ডিসেম্বর রাজশাহী, ৪ ডিসেম্বর খুলনা ও ৫ ডিসেম্বর বরিশালে বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৫ নভেম্বর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পুলিশি বাঁধা

গত ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের সমাবেশে জমায়েতের একাংশ

বান্দরবনের চিম্বুক পাহাড়ে ম্রো জনগোষ্ঠীর ভূমিতে হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বান্দরবনের চিম্বুক পাহাড়ে সিকদার গ্রুপ (আর এন্ড আর হোল্ডিংস) ও সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট এর যৌথ উদ্যোগে পাঁচতারা হোটেল ও পর্যটন স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে সে এলাকায় বংশপরম্পরায় বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠীকে বসতবাটি ও জুমচাষের জমি থেকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনামলে তথাকথিত উন্নয়নের নামে মুষ্টিমেয় দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে পাহাড়-সমতল সর্বত্র প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে, আবাদী জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, নদী-খাল-বিল-বন-পাহাড় উজাড় করা হচ্ছে। উন্নয়নের নাম করেই চিম্বুক পাহাড়ে ও হোটেল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, অথচ সেখানে বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণের তোয়াক্কাই করা হলো না। ইতোমধ্যে স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকা ধ্বংসের আশঙ্কায় প্রতিবাদ-আন্দোলন করছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, চিম্বুক পাহাড় এলাকায় উক্ত হোটেল ও পর্যটন স্পট নির্মাণের নামে প্রায় ৮০০-১০০০ একর জমি বেদখল করা হচ্ছে, যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ম্রো-দের চারটি পাড়া ও পরোক্ষভাবে ৭০-১১৬টি পাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রায় ১০ হাজার জুমচাষী উদ্বাস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। জুম ভূমি ছাড়াও সেখানে ম্রো-দের বসতভিটা ও শ্মশান আছে। যে উন্নয়নে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মুনাফার পাহাড় গড়বে, কিন্তু বিপুল জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে কেমন উন্নয়ন? ঈরিহাস হলো – যে এলাকায় ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণ করতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় নেই।" তিনি আরো বলেন, "এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা 'চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট এ্যাক্ট' অনুযায়ী একটি বিশেষ অঞ্চল। এখানে যেকোন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের পূর্বে বিবেচনায় রাখতে হবে – এ এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ী বিভিন্ন জাতিসত্তার সংস্কৃতি-কৃষ্টি-জীবন-জীবিকা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অথচ চিম্বুক পাহাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে পাঁচতারা হোটেল ও পর্যটন স্পট হলে বংশপরম্পরায় বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমলে না নিয়ে উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে পাহাড় কেটে হোটেল-মোটেল নির্মাণ, পর্যটনের জন্য প্রাকৃতিক ঝর্ণা, ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ ও গতিপথ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক বনায়ন ইত্যাদির ফলাফল হচ্ছে অতিবৃষ্টিতে মারাত্মক পাহাড় ধ্বস। ২০১৫ সালে রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত ভয়াবহ পাহাড়ধ্বসের প্রেক্ষিতে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিও পর্যটনের নামে পাহাড় ধ্বংস বন্ধের সুপারিশ করেছিল। চিম্বুক পাহাড়ে পূর্বের একটি পর্যটন স্পট থাকার পরও বিশেষজ্ঞদের সমস্ত সুপারিশ উপেক্ষা করে এবং বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলে এ তৎপরতা চরম গণবিরোধী।" কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী চিম্বুক পাহাড়ে পাঁচতারা হোটেল ও পর্যটন স্পট নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীর আন্দোলনে পূর্ণ সংহতি জানান এবং অবিলম্বে জীবন-জীবিকা ও পরিবেশ ধ্বংসকারী এ ব্যবসায়িক প্রকল্প বন্ধে সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

সাম্যবাদ

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, বেল্ট এন্ড

প্রায় অধিকাংশ বন্দর ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত। এ মহাসাগর দক্ষিণ চীন সাগর, বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগরকে মুক্তার মালার মতো যুক্ত রেখেছে। আবার লোহিত সাগর সুয়েজ ক্যানেলের মাধ্যমে যুক্ত ভূমধ্যসাগরের সাথে, যার মাধ্যমে ইউরোপের বন্দরগুলোর সাথে ভারত মহাসাগর যুক্ত। ফলে ভারত মহাসাগরে যারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, তারাই এই সব অবিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। 'ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি' হলো এ অঞ্চলে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কৌশল। উদ্দেশ্য – এ অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানো।

উল্লেখ্য চীন ২০১৬ সাল থেকে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' নামের মেগা অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার অংশ হিসেবে এ সমুদ্রপথে চীনের প্রভাব বাড়ছে। এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকার এ কৌশল বাস্তবে এ অঞ্চলে চীনবিরোধী একটা সামরিক জোট খাড়া করানোর উদ্দেশ্য থেকেই প্রণীত। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে চীনকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত – এ চার দেশের সমন্বয়ে কোয়াড (কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ) নামে সামরিক জোট গঠন করা হয়েছে। ভূ-অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ফলে আমেরিকা যে বাংলাদেশকে একসময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে বাংলাদেশই এখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অশনি সংকেত হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের আসল উদ্দেশ্য কী

বাংলাদেশকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য থেকেই যে বিগানের বাংলাদেশ সফর, তা পূর্বেই আলোচনায় ছিল। বিগান তিনদিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে কি আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের লুকোচুরি, প্রশ্ন ও সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে। দৈনিক প্রথম আলোর ১৬ অক্টোবরের একটি রিপোর্টে তা স্পষ্ট উঠে এসেছে – "বৃহস্পতিবার সকালে স্টিফেন বিগানের সাথে আলোচনার পর আইপিএস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি বলেছে জানতে চাইলে আবদুল মোমেন বলেন, আইপিএস নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আমার সঙ্গে আইনের শাসন, রোহিঙ্গা সমস্যা, বিনিয়োগ, বঙ্গবন্ধুর খুনীকে ফেরত পাঠানো এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ... কি আলোচনা হয়েছে প্রথম আলোর এই প্রশ্নের জবাবে রাজধানীর একটি হোটেলে বিগান বলেন, 'আজ(বৃহস্পতিবার) আমি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আইপিএস নিয়ে আলোচনা করেছি। ... অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার এগিয়ে নিতে আমরা একে অন্যকে কীভাবে সহায়তা করতে পারি, তা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য তো বটেই, এর প্রতিবেশী দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনবে।" ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে দেখে এবং একটি স্বাধীন ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলা ও এগিয়ে নিতে আমরা নিজেদের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ এই অঞ্চলে আমাদের কাজের কেন্দ্রস্থল হবে।"(ইউএস অ্যাম্বেসি বাংলাদেশ ওয়েবসাইট)

এ প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিপদজনক ইঙ্গিত দেয়। তিনি বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের আইপিএস(ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি) এর ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে আইপিএস কার্যকর করতে এখানে অবকাঠামো উন্নয়নে অবশ্যই তাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) এগিয়ে আসতে হবে" (ঢাকা টাইমস-১৪ অক্টোবর ২০২০)। এর অর্থ – বাংলাদেশ এই স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনায় যুক্ত হতে আগ্রহী। বিনিময়ে বাংলাদেশ শুধু আদায় করবে 'সম্ভাবনাময় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের' ভিসা ইস্যুর বিষয়টি। আরও উদ্বেগজনক হলো, এর ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া 'কোঅপারেশন অ্যাফ্লোট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিং' সংক্ষেপে ক্যারেট ২০২০ গত ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে মার্কিন নৌবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে – ক্যারেট বাংলাদেশ ২০২০ এর "মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাজমান উদ্বেগগুলো মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করার এবং স্বাধীন ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের অংশীদারিত্ব আরো জোরদার করা হবে"(ইউএস অ্যাম্বেসি বাংলাদেশ ওয়েবসাইট)।

বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে যুক্ত করার জন্য আমেরিকার এ তোড়জোড় যে চীন ভালভাবে নেয়নি, বিগানের সফরের পরপরই চীনের প্রভাবশালী সরকারী পত্রিকা গ্লোবাল টাইমস-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং তা পরিষ্কার করেছেন। সে রিপোর্টটিতে বলা হচ্ছে – 'বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার ভাষায়, 'স্নায়ুযুদ্ধ যুগের মানসিকতা' পরিহার করার আহবান জানিয়েছেন। তার মূল্যায়ন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে তাদের চীনবিরোধী 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি' তে কাছে পেতে চাইছে। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু এ বিরোধের মূলে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানসিকতা। কারণ তারা চীনের দ্রুত বর্ধনশীল উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ উত্থানকে গ্রহণ করতে রাজি নয়' (দৈনিক ইনকিলাব ৩১ অক্টোবর ২০২০, www.globaltimes.cn, 24 October 2020)।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং বাংলাদেশ সফর করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চীনের 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এ বাংলাদেশকে যুক্ত করা। সেসময় চীনের সাথে বাংলাদেশের ২৫টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার বড় অংশই বাংলাদেশে নানা অবকাঠামো গড়ে তোলার চুক্তি, যা 'রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ' মেগাপ্রকল্পের সাথে যুক্ত। ফলে বিশ্ববাজার নিয়ে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনের চলমান দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই জন্য আমেরিকা কী করছে

গত ২৬ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ৫ দিনের এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে প্রথমে দিল্লি আসেন। তার এই সফরের উদ্দেশ্য যে Indo-pacific strategy, সফরের আগে এক টুইট বার্তায় তিনি তা জানিয়েছেন। ইন্দো-প্যাসেফিক ইস্যুতে এটা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ৩য় রাউন্ডের বৈঠক। এই বৈঠকের নাম 'টু প্লাস টু' (উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক)। ভারত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার সব থেকে কাছের মিত্র। তাদের এই মিত্রতা আরো বেড়েছে সাম্প্রতিক সময়ে লাদাখে ভারত-চীনের রক্তক্ষয়ী সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে । পম্পেও-র এই সফরে দুই দেশের মধ্যে 'বেসিক এক্সচেঞ্জ এন্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট' বা বেকা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির ফলে গোপন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধারণ করা চীন-ভারত সীমান্তের তৎপরতার চিত্র ভারতকে সরবরাহ করবে আমেরিকা। এর উদ্দেশ্য যে চীনকে মোকাবিলা করা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই 'টু প্লাস টু' বৈঠকের আওতায় সামনের দিনে চীনকে মোকাবিলার জন্য আরো কিছু চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে। দিল্লির সিনিয়ার কূটনৈতিক ভাষ্যকার জ্যোতি মালহোত্রার কথায়, "এই 'টু প্লাস টু' সংলাপে আলোচনার মূল এজেন্ডাই বলুন বা প্রধান আলোচ্য বিষয় বলুন – সেটা হলো চীন। আর সে কারণেই এতদিন অপেক্ষার পর এই মহামারির মধ্যেও মার্কিন মন্ত্রীরা দিল্লিতে এসেছেন। মার্কিন দূতাবাসের সূত্রগুলো আমাদের সরাসরি বলেছেন – এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান 'আগ্রাসী অবস্থানকে' কিভাবে রোখা যায়, বৈঠকে যাবতীয় আলোচনা হবে সেটাকে ঘিরেই।"

ভারত সফর শেষে মাইক পম্পেও যাবেন শ্রীলংঙ্কা ও মালদ্বীপে ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ভারতের চীন বিরোধীতার কারণে মিত্র হিসেবে ভারতকে আমেরিকা যেভাবে পাবে, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপকে সেভাবে পাবে না। সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলো চীনের প্রভাববলয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে। নেপাল যে তাদের নতুন মানচিত্র অনুমোদন করেছে, সেখানে ভারতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এই রকম তিনটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করেছে। নেপালের এই রকম ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যাপার ৪ বছর আগেও ভাবা যেত না।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতাও চলছে জোরেশোরে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট 'আসিয়ান'-এর দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার বিষয়টি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক অগ্রাধিকারের বিষয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সামরিক জোট 'ন্যাটো'-র মতো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি সামরিক জোট গঠনের কথাও বিভিন্ন পরিসরে আলোচিত হচ্ছে। মালদ্বীপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সই করেছে।

এর মধ্যে ভারত মহাসাগরে 'মেরিটাইম ফিউশন সেন্টার' (সমুদ্রগামী জাহাজের চলাচলের সমন্বয় করা) তৈরির পরিকল্পনা করছে আমেরিকা। এই ডোমেইন ফিউশন তৈরি হলে এটা তার আক্ষরিক কাজের বাইরেও যে অন্য কাজ করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ চীনের 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর সমুদ্র রুট এদিক দিয়েই যাবে। ফলে চীনের সাথে বাণিজ্যযুদ্ধে আমেরিকা জড়াবে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সামুদ্রিক সামরিক কৌশলের দিক থেকে এই অঞ্চল দিন দিন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বিশেষত চীন ও আমেরিকার কাছে। ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপের সামরিক ঘাটি থেকেই আমেরিকা ইরাকে অপারেশন চালায়। ইরানকে সে নজরদারীর মধ্যে রেখেছে এই ঘাটির মধ্য দিয়েই। আবার চীন এই অঞ্চলে না হলেও আফ্রিকার উপকূলীয় দেশ জিবুতিতে তার প্রথম সামরিক ঘাটি স্থাপন করতে যাচ্ছে, যার রুট এই অঞ্চলের ভিতর দিয়েই। ফলে সামরিক বাহিনী আনা-নেয়া, সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনে এই অঞ্চলে চীনের তৎপরতা বাড়বে। এই দিক থেকেই এই অঞ্চলের গুরুত্ব দিন দিন বাড়বে।

চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও এ অঞ্চলে তার প্রভাব

চীনের প্রেসিডেন্ট ২০১৩ সালে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' (পরবর্তীতে বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নামকরণ) নামে একটি উন্নয়ন কৌশল ও কাঠামো বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেন। এর মাধ্যমে বিশ্বের ৬০টি দেশের সাথে সড়ক ও নৌ-পথে চীনের মূল ভূ-খন্ড সংযুক্ত হবে। সড়কপথে এশিয়া ও ইউরোপের সাথে চীনকে সংযুক্ত করা হবে। এ সড়কপথের সাথে রেলপথ ও তেলের পাইপলাইনও পরিকল্পনার সাথে যুক্ত। আর সাগরপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সংযুক্ত হবে চীন। এজন্য চীন বিভিন্ন দেশে এ প্রকল্পের আওতায় বিশাল বিশাল রাস্তা, রেললাইন, পাইপলাইন, ল্যান্ডব্রিজ, সমুদ্রবন্দর ইত্যাদি নির্মাণ করবে।

এত বিশাল প্রকল্প নিয়ে চীন এগোচ্ছে কেন? চীনকে কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী দেশ ভাবা আমাদের দেশের কিছু বামপন্থী এতে কিছুটা পুলকিত, কিছুটা আশঙ্কাগ্রস্ত। কিন্তু প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, বর্তমানে যে চীনকে দেখছি, তা আর কমিউনিস্ট দেশ নেই। চীন পুঁজিবাদের পথে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর দেং শিয়াও পিংয়ের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা চীনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী পথে হাঁটতে শুরু করে। যার পরিণতিতে সমাজতন্ত্রের আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিকাশের পথে একটি নব্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে উন্নীত হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে চীনের অর্থনীতিতে মন্দা ঘনীভূত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী নতুন বাজার খোঁজার জন্য চীন হন্যে হয়ে উঠেছে। চীনের বিপুল অলস পুঁজি বিশ্বব্যাপী লাভজনকভাবে খাটানো, চীনা পণ্যের নতুন বাজার, কাঁচামালের উৎস যোগাড় ও আরো সস্তা শ্রম পাওয়ার লক্ষ্য থেকেই চীন এ মেগাপ্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। চীনা অর্থনীতির চাকা চালু রাখতে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার নিরবচ্ছিন্ন ও সুলভ সরবরাহ দরকার।

বিশ্বের শীর্ষ তেল আমদানিকারক দেশ চীন। পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানির জন্য চীনকে নির্ভর করতে হয় দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত মালাক্কা প্রণালীর ওপর। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মালাক্কা প্রণালী দিয়ে চীনকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা তেলের ৮০ ভাগই পরিবহন করতে হয়। দক্ষিন চীন সাগরে আমেরিকা ও জাপানের সাথে ক্রমবর্ধমান বিরোধ, মালাক্কা প্রণালীর অদূরে আন্দামানে ভারতের ঘাঁটি ইত্যাদি কারণে চীন এ পথের বিকল্প তৈরি করছে। আরব সাগর ও বঙ্গোপাসাগরে নতুন বন্দর তৈরি করে বিকল্প সে পথে তেল আমদানি করে চীন মালাক্কা প্রণালীর উপর নির্ভরতা কমাতে চাইছে। এ লক্ষ্যে রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় চীন পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে গদর বন্দও তৈরি করছে। চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের মাধ্যমে গদর বন্দরের সাথে রেল ও সড়কপথের মাধ্যমে সরাসরি চীনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল গদর বন্দর হয়ে চীনে পৌঁছাবে। আরেকটি বিকল্প পথের জন্য মিয়ানমারের কায়ুনপুতে চীনা সহায়তায় গড়ে তোলা হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর। একই সাথে মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে চীন পর্যন্ত তৈরি করা হচ্ছে গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন। শ্রীলঙ্কার হামবানতোতাতে চীনা ঋণে বন্দও তৈরি করা হচ্ছে। এ বন্দর তৈরি হলে ভারত মহাসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর বাজার আরও বেশি করে চীনের পণ্যের আওতায় চলে আসবে।

চীন বাংলাদেশের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল। বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিলেও, পরে ভারতের আপত্তিতে সে সম্মতি প্রত্যাহার করে। মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায় চীনের সমুদ্রবন্দর নির্মাণে ভারত যে সন্তুষ্ট নয়, তা স্পষ্ট। ভারত মনে করে, চীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতকে চারদিক থেকে ঘেরাও করছে। পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এ অঞ্চলে রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে ভারতের আধিপত্য কমে চীনের প্রভাব আরো বাড়ায় এবং ভারত ও আমেরিকা উভয় দেশই তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ায়, এ অঞ্চলে উত্তেজনা আরো বাড়বে তা বলাবাহুল্য। বাংলাদেশের জন্যও তা বিপদজনক হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের ভূমিকা ও মালিক শ্রেণীর স্বার্থ

এখন যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশকে আমেরিকা এবং ভারত এই কৌশলে যুক্ত করার কথা কিভাবে ভাবছে। বাংলাদেশেরই এক্ষেত্রে ভূমিকা কি?

কিভাবে আওয়ামী লীগ সরকার দু-কূল রক্ষা করছেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা প্রতিনিয়ত পত্র-পত্রিকা, টিভি টকশোতে অবিরাম শুনতে পাই। কিন্তু আমরা যদি খুঁটিয়ে বিচার করি তাহলে দেখবো – 'দেশের স্বার্থ', 'জাতীয় স্বার্থ', 'বাংলাদেশের স্বার্থ' কখনোই একক কোনো স্বার্থ হতে পারে না। আজকের দিনে একটা দেশ মানে এখানে প্রধানভাবে দুটো শ্রেণী অবস্থান করে। এক শ্রেণী শাসক – যারা ক্ষমতাকাঠামোর সাথে যুক্ত, বড় বড় ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অর্থাৎ মালিক শ্রেণী। আরেকদিকে সাধারণ মানুষ যারা – কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষক-ছাত্র, দোকানদার, রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা, দিনমজুর অর্থাৎ শোষিত শ্রেণী। সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম থেকে আমরা জানি, আজকের দিনে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ কখনো এক হতে পারে না। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে পাল্টাপাল্টি দুটো ইনিশিয়েটিভ, যার দুদিকেই বাংলাদেশ ভারসাম্য রক্ষা করছে বলে দাবি করছে এবং একে কূটনৈতিক সফলতা হিসেবে দেখানো হচ্ছে, আমাদের বিচার করতে হবে এই সফলতা কোন্ শ্রেণীর সফলতা, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থটা এখানে রক্ষিত হচ্ছে।

মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের সময় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রভাবশালী উপদেষ্টা বাংলাদেশের মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি সালমান এফ. রহমান এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সাথে একটি দ্বিপক্ষীয় ভার্চুয়াল সভায় যোগ দেন। তিনি তাদের সাথে দেখাও করেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এক বিশেষ টেলিফোন ব্রিফিং-এ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি রহমানের (সালমান এফ রহমান) সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বাংলাদেশের একজন অসামান্য চমৎকার এবং ব্যক্তিখাতের সফল ব্যক্তিত্ব।" এই 'চমৎকার' মানুষ সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ জানে। ২০১০ সালে কিভাবে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে পুঁজিবাজার থেকে সাধারণ মানুষের শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিনি। এবার করোনার সময় আমাদের দেশের ডাক্তার-নার্সরা যখন পিপিই'র অভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন ও মৃত্যুবরণ করছেন, তখন এই সালমান এফ রহমানের বেক্সিকো গ্রুপ ৬৫ লাখ পিপিই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। এই ধরণের মানুষরা 'চমৎকার' হয় কোন্ শ্রেণীর কাছে? বেগান হলো যুক্তরাষ্ট্রের মালিকশ্রেণির প্রতিনিধি, আর বাংলাদেশে এই শ্রেণীর বর্তমান প্রতিনিধি হলো আওয়ামী লীগ ও তার সরকার। আবার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজির একটা অন্যতম বিষয় হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা। যেখানে আমদানি/রফতানির যে শুল্ক তা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হবে। তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা কি ফ্রি শুল্কের কোনো সুবিধা পাবে? তাদের বেতন কি বাড়বে? তার জীবনমানের কি কোনো উন্নয়ন হবে? উত্তর হলো – না। শুল্কমুক্ত সুবিধার পুরো লাভটা পাবে ব্যবসায়ী/শিল্পপতি/ মালিকগোষ্ঠী। মালিকশ্রেণীর এই লাভের দরকষাকষি বেগান-সালমান এফ রহমানদের বৈঠকের মধ্যে হয়। এটাকেই তারা 'সফল কূটনীতি' বলে প্রচার করে। আর তাদেরই মিডিয়ায় এই সফল কূটনীতির প্রচার করা হয়। এই কূটনীতির সাথে সাধারণ মানুষের কোনো স্বার্থ নেই।

আবার অন্যদিকে চীনের সাথেও বাংলাদেশ 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' এ যুক্ত হতে চায়। এজন্য বেগানের সফরের পরপরেই চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করার জন্য ফোন করতে হয়। বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সাথে যুক্ত করার পুরষ্কার চীন বাংলাদেশকে দিচ্ছে, বাংলাদেশে সবথেকে বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই বিনিয়োগের একটা বড় অংশ নিয়োজিত অবকাঠামো খাতে। অবকাঠামো খাতের সাব-কন্ট্রাক্টগুলো পায় ক্ষমতাসীন দলের লোকজন। তারা রাতারাতি কিছু প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে ফেলেছে এই সব সাব-কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য। এদের উপর ভর করেইতো আওয়ামী লীগ ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন করলো। এখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ কোথায়?

বিদেশী বিনিয়োগ ও জনগণের স্বার্থ

চীন-মার্কিন-ভারত দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের বাজার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার স্বার্থের সংঘাত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ এ বিরোধের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কাও বাড়ছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে আমরা দেখছি – আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থান হচ্ছে, সরকার আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ও চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ দুটোতেই যুক্ত থাকবে। বাংলাদেশকে যেহেতু সবার দরকার, তাই সবার থেকে যত বেশি সুবিধা আদায় করা যায়, সে অবস্থান তারা ব্যক্ত করছেন।

আমরা যদি সামরিক সংঘাতের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাদও দেই, এ বিশাল সব বিদেশী বিনিয়োগ প্রকল্পে কি দেশ ও জনগণের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষিত হবে? আওয়ামী লীগ সরকার পুঁজিপতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবেই ক্ষমতায় আছে। তাদের চোখে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বলতে তারা মালিকশ্রেণীর স্বার্থই বোঝেন। আমেরিকা, জাপান, চীন বা ভারত যাদের বিনিয়োগ হোক না কেন, তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে লাভবান হবে আমাদের দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী। আমেরিকা গ্যাস-তেল খাত, বিদ্যুৎ, এলএনজি প্ল্যান্ট, ওষুধ শিল্প, কৃষিব্যবসা, আইটি খাতে বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এতে যে সালমান এফ রহমানসহ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী লাভবান হবে, তা খোলাচোখেই বোঝা যায়।

জাপান তার বিগ বি প্রকল্পে ● ৭ এর পাতায় দেখুন

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, বেল্ট এন্ড

বিনিয়োগ করছে মহেশখালী মাতারবাড়ি কয়লাবিদ্যুৎ, বন্দর, এলএনজি প্ল্যান্ট ইত্যাদিতে। চীন তার বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর জন্য সংযোগ সড়ক ও করিডোর নির্মাণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত খাত, কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, কয়লাখনির আধুনিকীকরণ ইত্যাদিতে অর্থায়ন করবে। এগুলো সবই ঋণ, আর এ ঋণ সুদে আসলে শোধ করতে হবে জনগণকেই। চীন-জাপান বিশাল বিশাল মেগা প্রজেক্টে বিনিয়োগ করছে, তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে বলে সরকার দাবি করে। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য সরকার বিদেশী পুঁজিকে ঢালাও সুযোগ করে দিচ্ছে। ১০ বছর পর্যন্ত কর অবকাশ, শতভাগ মালিকানার সুযোগ, বাধাহীনভাবে মুনাফা ও লভ্যাংশ স্থানান্তর করার সুযোগ, স্থানীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। কোন বিদেশী বিনিয়োগকারী তার নিট মূলধন দেশে ফিরিয়ে নিতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে না।

এই যে বিশাল বিদেশী বিনিয়োগ তার বেশিরভাগ অবকাঠামো খাতে। তার সাব-কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা। ঋণের টাকায় পরিচালিত এ মেগা প্রজেক্টগুলোর ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে। এ ঋণের বোঝা যত বাড়বে, সরতারী তহবিলে যে ঘাটতি তৈরি হবে, সে ঘাটতি মেটাতে সাধারণ মানুষের উপর যে বিপুল ট্যাক্স ও মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানো হবে। আর বিদেশী বিনিয়োগের বৃদ্ধিতে যে উল্লাস, তাও কতটুকু যুক্তিসম্মত? বিদেশী বিনিয়োগ কোথায় হচ্ছে? কেন হচ্ছে? চীনে যেখানে শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৪৩২ ডলার, বাংলাদেশে তা মাত্র ৭০ ডলার। ফলে সস্তা শ্রম শোষণের জন্যই বিদেশী পুঁজি আসছে। এসব বিনিয়োগে আমাদের দেশের শ্রমিকের জীবনমান উন্নত হবে কি? তথ্য হলো – সর্বোচ্চ ডলার উপার্জনকারী ইপিজেডের শ্রমিক সারাবছর ধার-দেনা করে বাঁচেন, কম খেয়ে বাঁচেন, অপুষ্টি আর রক্তশূণ্যতায় বাঁচেন(মেড ইন পোভার্টি, অক্সফাম ২০১৯, মাহা মির্জা, প্রথম আলো)।

আওয়ামী লীগ সরকার ১০০ ইপিজেড করার পরিকল্পনা করেছে, ১ লাখ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, কর্মসংস্থান হবে বলা হচ্ছে, তাও কতটুকু? পায়রা প্রকল্পে কাজ করছেন ৩০০০ চীনা শ্রমিক, রামপালে কাজ করছেন কয়েকশ ভারতীয় শ্রমিক। হাজার হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, কৃষকদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষেরা কাজ হারাচ্ছেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পাটকল, চিনিকল, কাগজকল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারাচ্ছেন। দেশের জনগণের প্রয়োজননির্ভর স্বাধীন, স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি নির্মাণের জন্য শিল্পায়ন না করে বিদেশী বিনিয়োগনির্ভর রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপন হয়তো সাময়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটায়, অর্থনীতির নানা সূচকে উল্লম্ফন ঘটায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তার ফলাফল কি? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯৯৭ সালে সংঘটিত ফিনানসিয়াল ক্রাইসিস কি আমাদের মনে নেই? আজকের বাংলাদেশের মতোই অবাধ ও লোভনীয় সুযোগ দেওয়ায়, বিদেশী পুঁজি হুহু করে সেসব দেশে ঢুকেছিল, জিডিপি বাড়তে থাকে। কিন্তু যখন বিদেশী পুঁজি হঠাৎ করে একের পর এক দেশ ছাড়তে থাকে, রাতারাতি উন্নয়নের সে বেলুন সশব্দে ফেটে যায়। বাংলাদেশও সে ঝুঁকিতে অবস্থান করছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ও বেল্ট-রোড ইনিশিয়েটিভ কোনোটাতেই জনগণের লাভ নেই, আছে বিপদের আশংকা যুক্তরাষ্ট্র যত নিশ্চয়তাই দিক, ইন্দো-প্যাসিফিক ফোরামের অন্যান্য উপকারিতার যত অঙ্গীকারই থাকুক, এটা যে চীনবিরোধী যুক্তরাষ্ট্র-ভারতকেন্দ্রিক একধরনের সামরিক জোট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আর প্রভাব বিস্তারের লড়াই ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ বিবদমান কোনো পক্ষে যাওয়ার অবস্থানেই নেই। আমাদের মতো দেশের কোনোভাবেই সামরিক প্রতিযোগিতার বলয়ে ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। এতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে। বৃহত্তর ভূ-কৌশলগত খেলায় খেলোয়াড় হওয়ার অভিপ্রায় বাংলাদেশের জন্য সুখকর হবে না।

চীনের সাথে 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'র সাথে যুক্ত হওয়া বা আমেরিকার 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি'তে যুক্ত হওয়ার মধ্যে বা 'ভারসাম্য রক্ষা করা'র মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থ নেই। কারণ চীন-আমেরিকার পাল্টাপাল্টি এই কৌশল যতটা বাণিজ্যিক, ততটাই সামরিক। বাণিজ্যিক দিক থেকে এখানকার মালিকশ্রেণির স্বার্থ থাকলেও সাধারণ মানুষের এখানে কোনো স্বার্থ নেই। আর সামরিক দিকটা হলে চীন-আমেরিকার সামরিক প্রতিযোগিতার মুখে বাংলাদেশ একটা বসবাসের অযোগ্য বাফার স্টেট এ পরিণত হবে। মালিকশ্রেণির সেকেন্ড হোম আছে তারা সেখানে চলে যেতে পারবে। সাধারণ মানুষের ফাস্ট হোম বা সেকেন্ড হোম এই ভূখন্ড। যে ভূখন্ড তারা অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন করেছে। এই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, দোকানদার, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষিত সচেতন নাগরিকদের আমরা অনুরোধ করবো – এ দ্বিমুখী আন্তর্জাতিক সামরিক ও বাণিজ্যিক জোটে সরকার যেন যুক্ত হতে না পারে সেই জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নেয়ার জন্য সরকারকে বাধ্য করা। এই আন্দোলনকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার অংশ হিসেবে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেয়া।

পাটকলের পর এবার চিনিকল

ভূমিকা পালন করে । এছাড়াও বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা খরচের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়ে দেয়। বিএসএফআইসি'র মতে, দেশে বার্ষিক চিনির চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ টন। ২০০২ সালের আগ পর্যন্ত বিএসএফআইসি এককভাবে সারাদেশে চিনি উৎপাদন ও আমদানি করে নির্ধারিত দরে ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছে দিত। এতে একদিকে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হত। অন্যদিকে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিলো। ২০০২ সাল থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে চিনি আমদানি অবাধ করা হয়। এখন আমাদের ভাবা জরুরি – চিনি আমাদের কতটুকু প্রয়োজন? আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা কত এবং কী পরিমান আমদানি করা দরকার?

২০০৪ সালে রিফাইনারিগুলো উৎপাদনে যুক্ত হওয়ার আগে নিবন্ধনপত্রে শর্ত ছিলো উৎপাদিত চিনির ৫০ শতাংশ রপ্তানি করতে হবে। সে শর্ত কম্পানিগুলো একদমই মানেনি। উল্টো অতিরিক্ত র-সুগার (অপরিশোধিত চিনি) আমদানি করে দেশি চিনির বাজারকে সংকটে ফেলেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি করা হয়েছে। এর ফলে দেশে উৎপাদিত চিনি অবিক্রিত থাকছে। এজন্য দায়ী সরকারের আমদানী উদারীকরণ নীতি ও বড় বড় কোম্পানিগুলোকে মুনাফা করিয়ে দেয়ার শ্রেণীগত স্বার্থ ।

আমদানিকৃত অপরিশোধিত চিনি মূলত উৎপাদিত হয় সুগার বিট থেকে। আর দেশি চিনি উৎপাদিত হয় আখ থেকে। আখ থেকে উৎপাদিত চিনি আমদানিকৃত চিনির তুলনায় অধিক স্বাস্থ্যসম্মত। কিন্তু দেশি চিনির বিপনন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। ফলে তা আমদানিকৃত চিনির সাথে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিকতে পারছে না।

অন্যসব রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের মত এ শিল্পেরও শুরু অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর দুর্দশার কারণ খুঁজতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ মূলত ৩টি সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো – পুরনো যন্ত্রপাতি, মিলের অভ্যন্তরের দুর্নীতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু চিনি নীতির অভাব (সর্বজনকথা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬)।

চিনিকলগুলোর কাঁচামাল আখ। অথচ প্রতিবছর এর চাষ কমে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আখচাষ ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এতে কলগুলোতে আখের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। ফলে ২-৩ মাসের বেশি সময় মিলগুলোকে সচল রাখা সম্ভব হয় না। আর তাই জনশক্তির পুরো ব্যবহার হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন আখ চাষ কমছে কেন?

এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় – চাষীরা উপযুক্ত দাম পায় না। আখ সরবরাহ করলেও নির্ধারিত সময়ে মিল কর্তৃপক্ষ দাম পরিশোধ করে না। এছাড়াও মিল কর্তৃপক্ষ দেরিতে আখ ক্রয় করে। ফিল্ড অফিসাররা চাষীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ পর্যন্ত রাখেন না। অথচ প্রয়োজন ছিলো চাষীদের মাঝে উন্নত জাতের আখের বীজ, সার এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ করা, সময়মত দাম পরিশোধ করা।

উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীরাও ভালো নেই। সরকার ২০১৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নতুন বেতন ও মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করে। কিন্তু চিনিকলগুলোতে তা বাস্তবায়িত হয়নি (দৈনিক যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)। বকেয়া আছে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন। এর পরিমাণও কয়েক কোটি টাকা। এই অবস্থায় তাদের কষ্ট অবর্ণনীয়। কেন সময়মত বেতন পরিশোধ করা হয় না – এ প্রসঙ্গে মিল কর্তৃপক্ষের বরাবর উত্তর – 'চিনি বিক্রি না হওয়ায় বেতন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

আজ চিনিকলগুলো বহুমাত্রিক সংকটে জর্জরিত। অথচ ২০ বছর আগেও এসব চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন ছিলো প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন। মিলের যন্ত্রপাতি মেরামত ও আধুনিকায়ন না হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা কমে বর্তমানে ৬৮ হাজার টনের কাছাকাছি চলে এসেছে। যন্ত্রপাতি পুরাতন হওয়ায় কমছে উৎপাদন, উল্টো বাড়ছে উৎপাদন খরচ। প্রতি কেজি চিনি উৎপাদনে ব্যয় হচ্ছে সর্বনিম্ন ৮৮ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৩২ টাকা পর্যন্ত। মিলগেট থেকে উৎপাদিত চিনি বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি দরে। উৎপাদন খরচ বেশি, অথচ বিক্রি কম দামে তাই লোকসান হচ্ছে। পূর্বে এই কলগুলো লোকসানী ছিলো না। এখন প্রশ্ন, বর্তমানে এই লোকসান কি দূর করা সম্ভব নয়? লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণই কি সমাধান?

খুব প্রচার দিয়ে বলা হয় – রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান লোকসান করছে। এই লোকসানী প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রেখে সরকার কী করবে? লোকসানী প্রতিষ্ঠান সরকারের বোঝা, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের বোঝা সরকারকে বহন করতে হলে সেই সরকার অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে – ইত্যাদি বহু আলোচনা। সরকারের প্রচারযন্ত্র এবং মালিকী ব্যবস্থার মিডিয়া অবিরত এ প্রচার চালাতে থাকে। সাধারণ মানুষও মনে করে – এতো করে যখন বলছে তখন হয়তো সত্যিই তাই। অনেকে বলেন – সরকার কি কখনো জনগণের খারাপ চাইতে পারে? তাই সরকার যা করছে জনগণের ভালোর জন্যই করছে, দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্যই করছে।

কিন্তু যে কথা জানা দরকার তা হলো – এই লোকসানের সমস্তটাই আরোপিত। বিরাষ্ট্রীয়করণের সাথে পুঁজি বিনিয়োগের গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। অর্থাৎ কারখানাগুলো বেসরকারি খাতে চলে গেলেই পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ করে মুনাফা কিংবা সরাসরি লুণ্ঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকারের পক্ষে বিরাষ্ট্রীয়করণকে কৃতিত্ব হিসেবে দেখানো হয় এবং এর পক্ষে প্রচার চালিয়ে জনমত তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড এবং ২০০০ সালে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন। এই প্রতিষ্ঠান দু'টির কাজই হচ্ছে লোকসানের অজুহাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দেয়া। এবং তা করা হয় নাম-মাত্র মূল্যে। একটি রিপোর্টে প্রকাশ – ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬০ শতাংশের অধিকই অস্তিত্বহীন ও বাকী প্রায় ৪০ শতাংশের অবস্থা রুগ্ন এবং বেহাল। অনেকক্ষেত্রে যে শর্তে রাষ্ট্র ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়, মালিক সে শর্ত মানেন না। অবাধ লুটপাট আর দখলদারিত্ব কায়েম হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসানের বিষয়ে রাষ্ট্র চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো – রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জনগণের প্রতিষ্ঠানকে যখন নামমাত্রে মূল্যে ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেয়া হয় কিংবা ইনসেনটিভের নামে জনগনের ট্যাক্সের হাজার হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়, তখন এর জবাব আমরা পাই কী?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনগণের জন্য নয়। এ ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক। সরকার মাত্র ৫টি রিফাইনারি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নিশ্চিত করতে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। ভেবে দেখছে না, চিনিকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে কর্মহীন হয়ে পড়বে শ্রমিক-কর্মচারী, ক্ষতিগ্রস্ত হবে আখচাষী কৃষক। সরকার দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে এসব প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা সম্ভব। এখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে – একথা সরকারকে ভাবতেই হবে। করোনাকালে আওয়ামী সরকার বন্ধ করেছে ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল। যখন দরকার ছিলো বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তখন উল্টো সরকার মানুষকে বেকার করছে । পাটকল শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে লড়ছে। একইভাবে চিনিকল বন্ধের এই অযৌক্তিক-অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সংগ্রাম কমিটি করতে হবে, লড়তে হবে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে। আর একমাত্র এই লড়াইয়ের মাধ্যমেই চিনিকলগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব।

দেশে দেশে জনবিক্ষোভ

নাইজেরিয়ায় পুলিশের বিতর্কিত এবং ঘৃণিত একটি বিশেষ স্কোয়াড স্পেশাল অ্যান্টি-রবারি স্কোয়াড (সার্স) ভেঙ্গে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশের সীমাহীন নির্যাতন, দুর্নীতি ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাড়ায়। এই বিক্ষোভ বাস্তবে নাইজেরিয়ার ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে রূপ নেয়। নাইজেরীয় তরুণ প্রজন্ম রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন চাইছে। বিক্ষোভে নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৯ জন। ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে নতুন শ্রমিক আইন পাসের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন হাজারো মানুষ। তাদের সরিয়ে দিতে টিয়ার গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। নতুন আইন বাতিলের দাবিতে এ বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় আন্দোলনকারীরা। ইকুয়েডরে করোনায় অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন জনগণ। মূলত চাকুরি, বেতন ইত্যাদির অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে জনতা।

শুধু তাই নয়, গোটা অক্টোবর মাস জুড়ে বিক্ষোভ হয়েছে বিশ্বব্যাপী। পুলিশ বাহিনীকে নতুনভাবে সাজানোর দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় বিক্ষোভ করেছে শত শত মানুষ। কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার জামিনে মুক্ত হওয়ায় রাস্তায় নামেন তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সময় এসেছে পুলিশ বিভাগ সংস্কারের। বিক্ষোভ হয়েছে আর্জেন্টিনায়ও। বেকারত্ব ও দারিদ্রতার হার কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে। মহামারী করোনার কারণে দেশটিতে হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। অনেককে বাস করতে হচ্ছে খোলা জায়গায়। এছাড়া তুরস্কের দখলে থাকা বিতর্কিত একটি সমুদ্র সৈকত খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাইপ্রাসের রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে। এ ছাড়াও ভারতে মোদি সরকারে সাম্প্রদায়িক এনআরসির বিরুদ্ধে, ফ্রান্সে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ইয়োলো ভেস্ট আন্দোলন, বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, পাটকল ও চা শ্রমিকদের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে সংগঠিত জনগণের এ সকল আন্দোলনের সারসংক্ষেপ করলে কিছু বিষয় সামনে আসে। সেগুলো হলো, চাকুরিচ্যুতি, বেকারি, ছাঁটাই, বেতন হ্রাস, দমন-পীড়ন, অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল, সাম্প্রদায়িকতা-বর্ণ বৈষম্য, মূল্যবৃদ্ধি, নারী-শিশু নির্যাতন ইত্যাদি ইস্যু। এক কথায় এই সংকটগুলো সকল দেশের সাধারণ সংকট। চলমান বিশ্বব্যবস্থা এই সংকটগুলোর সমাধান করতে পারছে না। এবার আমরা এই বিষয়গুলোর কার্যকারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

তীব্র অর্থনৈতিক সংকট বা এবেলা-ওবেলার সংকট

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখন তার ৩য় সাধারণ সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটটি কি? এই ব্যবস্থাটি মূলত মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত। ফলে সবকিছুর কেন্দ্র সর্বোচ্চ মুনাফা। এখানে পুঁজি প্রতিনিয়ত পুনরুৎ-পাদনে না গেলে তার বৃদ্ধি ঘটে না। আবার পুঁজির এত বিকাশ ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে, তা পুনরুৎপাদনে গেলে অতি উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। এই অতি উৎপাদন মানে জনগণের সকল চাহিদা পূরণের পর বাড়তি উৎপাদিত পণ্য থেকে যাচ্ছে বিষয়টি এমন নয়। বরং বেশিরভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই। উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেকার বিরোধাত্মক সম্পর্কটি গোটা ব্যবস্থাকে অস্থির করে তুলে। অর্থাৎ পুঁজির ধর্ম পুনরুৎ-পাদন, এর মাঝেই সে বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেখা দেয় অতি উৎপাদনের সংকট। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পুঁজিবাদ এই অর্থনৈতিক সংকট সাময়িকভাবে মোকাবিলা করে কোনরকমে চলতে পারতো, কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সাময়িক স্থিরতাও আর অবশিষ্ট নেই। এটা এবেলা-ওবেলার সংকটে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। এই কারণে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তোলা, কর্মসংস্থান, চাকুরির নিশ্চয়তা, টেকসই উন্নতি কোনটাই এই ব্যবস্থা আর দিতে পারছে না। উপরন্তু বাজারে একটা কৃত্রিম তেজীভাব তৈরির জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে, আর সামরিক অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ, যুদ্ধ যুদ্ধভাব, স্থানীয় ও আঞ্চলিক যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদির জন্ম দিচ্ছে। যার বিরূপ প্রভাব আবার মেহনতি জনগণেরর উপরই পড়ে। তাই এক সময়ে বলা হতো পুঁজিবাদ সংকটে পড়েছে, আর এখন কার্যত পুঁজিবাদই একটি সংকট।

ফ্যাসিবাদ আজ সব দেশের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বব্যাপী নজর দিলেই দেখা যায় – উন্নত-অনুন্নত সকল দেশে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, জাতি-ধর্মে বিভেদ সংঘাতে পূর্ণ। দেশে দেশে জনগণের ন্যায়সংগত আন্দোলনে হিংস্র বলপ্রয়োগ, বিরুদ্ধ মত দমন, মুক্তবুদ্ধির কণ্ঠরোধ শাসকদের একটা সাধারণ প্রবণতা। শুধু তাই নয় – ভোট চুরি, জোর করে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সকল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বাস্তবে বহুদিন পূর্বেই পুঁজির অবাধ বিকাশের দিন শেষ হয়েছে। ট্রাষ্ট, সিন্ডিকেট, কার্টেলের মাধ্যমে দেশে দেশে লুটতরাজ, জবরদখল ছাড়া বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাঁচার আর পথ নেই। পূর্বেই দেখানো হয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আর কোন স্থায়িত্ব নেই, সে সংকটাপন্ন, মরণ ভয়ে ভীত। তাই একদিন মতামতের সংঘর্ষ, ভিন্নমতের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিকতা-বেঠিকতা নির্ণয়ের যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছিল, সে আর তা চায় না, দিতে পারে না।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে একটা 'চেক এন্ড ব্যালেন্স' রাখার কোন প্রচেষ্টা আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না, বরং সব বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিভাগ অত্যন্ত নগ্নভাবে কেন্দ্রীভূত। এ অবস্থায় জনস্বার্থ রক্ষার সকল সম্ভাবনা প্রায় রুদ্ধ। তাই একদিকে চলে তীব্র দমনপীড়ন-ত্রাসের সঞ্চার, অন্যদিকে চলে ভাবাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ। আমরা দেখছি 'ডিজিটালাইজেশন'র নামে দেশে দেশে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের ব্যাপক প্রসার, তার সাথেই চলে কুসংস্কার, পশ্চাদপদ চিন্তা ও উগ্রজাত্যাভিমানের তীব্র প্রচার। যা মানুষে মানুষে অনৈক্য ও বিভেদ এবং একই সাথে ভোগসর্বস্বতা সৃষ্টি করে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিকেই বলা হয় 'ফ্যাসিবাদ', যা আজ গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

গণবিক্ষোভ, ভাবাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ ও করনীয়

এত কিছুর পরও শাসকরা না পারছে কোনভাবে জনবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে, না পারছে জনজীবনের সমস্যার সমাধান করতে। তাই সময়ের সাথে শুধু হিংস্র বলপ্রয়োগই নয়, ভাবাদর্শগত নিয়ন্ত্রণের পথে হাটছে তারা। শাসকরা মানুষের মাথায় 'আইডিয়া ম্যানুফ্যাকচার বা ইনপুট' করছে। তাই বিশ্বব্যাপী বাস্তব সমস্যা থেকে জনগণ রাস্তায় নামছে, রক্ত ঝরাচ্ছে, কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। যে মানুষগুলি পুঁজিবাদের সীমাহীন সংকটে বিপর্যস্ত, আন্দোলনে নামছে সেই মানুষগুলোই আবার চিন্তাগত, জীবনচর্চাগত ক্ষেত্রে শাসকদের অনুসৃত পথেই বিচরণ করে। ফলে আন্দোলন দিশা পায় না, পথভ্রষ্ট হয়। আক্রমণের মুখে হতাশা নেমে আসে। অর্থাৎ বাস্তব পরিবেশের চাপে মানুষ রাজপথে নামে, কিন্তু সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ঘটে না। আর এখানেই প্রয়োজন জনগণের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ অর্থাৎ বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজনীয়তা। বিপ্লবী পার্টি ইতিহাসলব্ধ যুক্তি-বিজ্ঞানের আলোকে শাসকদের সকল মিথ্যাচার, ভাবাদর্শগত আক্রমণকে অকার্যকর করে দেবে। একইসাথে এই সামগ্রিক জ্ঞানের ভিত্তিতে অপরাজেয় সাংগঠনিক শক্তির আঘাতে জনআকাঙ্খার বাস্তবায়ন ঘটাবে। অর্থাৎ শোষণমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজ কায়েম হবে। এর ছাড়া আর কোন বিকল্প আছে কি?

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২০

মওলানা ভাসানীর প্রতি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ১৭ই নভেম্বর সংগঠন কার্যালয়ে।

দেশে দেশে জনবিক্ষোভ কারণ ও করণীয়

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জনগণের স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। জনগণ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে যুক্ত হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে । থেমে থেমে বিক্ষোভ আরও সহিংস রূপ নিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কেন এমন ঘটছে? কোন্ পথে এর সমাধান?

থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে। মূলত শিক্ষার্থীরাই এসব বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০১৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থেকে দেশের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। কথিত আছে, থাইল্যান্ডের প্রজা হলো রাজার পায়ের ধূলো। থাইল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, রাজ পরিবারকে অবমাননা করলে ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। বিক্ষোভ দমনে জরুরি অবস্থা জারি, গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলার পথ নিয়েছে সরকার।

৭ এর পাতায় দেখুন

ভারতের সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল এক বিবৃতিতে ভারতের চলমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন এবং এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের জন্য ভারতের কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ভারতের কৃষকদের সাম্প্রতিক দিল্লী ঘেরাও অভিযান উপমহাদেশের সমগ্র কৃষকসমাজকে বাঁচার দাবিতে সংগ্রাম গড়ে তোলার পথ দেখিয়েছে। ফ্যাসিবাদী মোদী সরকারের নির্যাতন, বাধা ও হুমকি মোকাবেলা করে অদম্য মনোবল নিয়ে আপনারা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করছেন, তা আমাদের অত্যন্ত উৎসাহ যুগিয়েছে। ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি মোদী সরকার সেখানকার কৃষিক্ষেত্রকে লগ্নীপুঁজির জন্য খুলে দিতে কৃষিতে সরকারের মূল্য সহায়তা কমিয়ে যেভাবে কৃষি আইন সংস্কার করেছে – বাংলাদেশের পরিস্থিতিও তা থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। এখানেও কৃষক ফসলের লাভজনক মূল্য পাচ্ছে না, সরকার চাষীদের রক্ষায় কোন দায়িত্ব নিচ্ছে না। অথচ চাষের খরচ বাড়ছে, কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে, কৃষক ঋণের ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ছে। সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে কৃষি উপকরণ কোম্পানী ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী-আড়তদার-মিলমালিকদের। ফলে আমাদের দু'দেশের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ ও বাঁচার পথ অভিন্ন। আর সে পথ হচ্ছে – কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে লাগাতার, জঙ্গী ও রাজনীতিসচেতন চাষী আন্দোলন গড়ে তোলা। ভারতের কৃষকরা এক্ষেত্রে এক অনুপ্রেরণাদায়ক ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের ক্ষেতমজুর ও কৃষকসমাজের পক্ষ থেকে আমরা পুনর্বার ভারতের চাষী ও ক্ষেমজুরদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।"

ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা শ্রমিক ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলার ৭ দফা দাবিতে সংহতি সমাবেশ।

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে পিটিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যার বর্বরতার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

"ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রবাদ-মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন"

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে একটি মসজিদে কথিত কোরান অবমাননার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনিতে হত্যা ও মৃতদেহ আগুনে পোড়ানোর নৃশংসতার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ আজ ৩০ অক্টোবর শুক্রবার বিকাল ৫টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ(মার্কসবাদী) নেতা জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, নাঈমা খালেদ মনিকা, সীমা দত্ত, জয়দীপ ভট্টাচার্য্য, রাশেদ শাহরিয়ার প্রমুখ। প্রতিবাদ সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকায় রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনায় নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস-কমেন্ট দিয়ে ধর্ম অবমাননার 'অভিযোগে' কুমিল্লার মুরাদনগরের কোরবানপুর গ্রামে কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে ভাঙ্গচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং হামলার উস্কানিদাতা ও জড়িতদের গ্রেপ্তার-বিচার দাবি করেছেন। বিবৃতিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "লালমনিরহাটের বুড়িমারিতে কথিত কোরান অবমাননার অভিযোগে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার পর মুরাদনগরের ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এদু'টি ঘটনা ছাড়াও সাম্প্রতিককালে ফেসবুকে লেখায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে অনেকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা-গ্রেপ্তার-প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হামলার

৩ এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নীতিগত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশ

অনলাইনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নীতিগত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে গত ২৮ অক্টোবর ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, সহসভাপতি জয়দীপ ভট্টাচার্য এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ। ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি-জালিয়াতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। অনলাইন প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এটা আরো বেড়ে যাবে। নেতৃবৃন্দ ভর্তির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো পর্যালোচনা ও মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে একের পর এক সরকারের এই প্রকার কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবাদ জানান। একইসাথে ভর্তি পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান।

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org